৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ০৪

টপিক:

মুক্তিযুদ্ধ-১: মুজিবনগর সরকার গঠন ও কার্যাবলি, মুক্তিযুদ্ধে ভারতসহ পরাশক্তি (আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স) ও জাতিসংঘের ভূমিকা, পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় (বিজয় অর্জন)

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

মুজিবনগর সরকার গঠন ও কার্যাবলি

নাম	জন্মস্থান	পদমর্যাদা ও দায়িত্ব
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	রাষ্ট্রপতি – পদাধিকার বলে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক।
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	কিশোরগঞ্জ	উপ-রাষ্ট্রপতি – (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং পদাধিকার বলে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক)।
তাজউদ্দিন আহমেদ	কাপাসিয়া, গাজিপুর	প্রধানমন্ত্রী – প্রতিরক্ষা, তথ্য প্রচার এবং টেলিযোগাযোগ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন, শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সরকার, স্বাস্থ্য, শ্রম এবং সমাজকল্যাণ, সংস্থাপন এবং প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত।
ক্যাপ্টেন মনসুর আলী	সিরাজগঞ্জ	অর্থমন্ত্রী এবং জাতীয় রাজস্ব, শিল্প, বাণিজ্য ও পরিবহণ মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত।
খন্দকার মোশতাক আহমেদ	দাউদকান্দি, কুমিল্লা	পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

[illegible]

মুক্তিযুদ্ধ: [illegible]

[illegible]: [illegible]

- [illegible] = ৬ জন
- [illegible] = ৪ জন
- [illegible] = ১ জন
- [illegible] = ১ জন

[illegible]

- [illegible] = ১৬ [illegible]
- [illegible] " " = ২৯ [illegible]
- প্রধান [illegible]: ৩ [illegible]
- [illegible]: [illegible]
- [illegible] [illegible]
- [illegible]

[illegible]

✓ มีนา : เมษา

✓ หนาว

✓ ตุลา

✓ ร้อน

✓ ฤดูฝน :

• มกราคม : 3 เดือน : 1 ปี

✓ = [illegible] มกรา : ประสิทธิ์ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

= หนาว : [illegible]

= ร้อน

✓ [illegible]

✓

মুজিবনগর সরকার গঠন ও কার্যাবলি

নাম	জন্মস্থান	পদমর্যাদা ও দায়িত্ব
এ এইচ এম কামারুজ্জামান	রাজশাহী	স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ত্রাণ, পুনর্বাসন ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত।
কর্নেল (অব.) এম. এ. জি ওসমানী	সুনামগঞ্জ	সেনাবাহিনীর প্রধান (মন্ত্রীর পদমর্যাদা)।
কর্নেল (অব.) আব্দুর রব	বানিয়াচং, হবিগঞ্জ	সেনাবাহিনীর উপপ্রধান- চিফ অব স্টাফ।
গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার	রংপুর (নিজ জেলা: পাবনা)	ডেপুটি চিফ অব স্টাফ।

মুজিবনগর সরকার গঠন ও কার্যাবলি

একনজরে মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ

	পদ	দল বা সরকারের অবস্থান	প্রতিনিধিত্ব
১	আহ্বায়ক	প্রধানমন্ত্রী– তাজউদ্দীন আহমেদ	মুজিবনগর সরকার
২	সদস্য	মাওলানা আবদুল হামিদ খান	ন্যাপ (পিকিংপন্থি)
৩	সদস্য	কমরেড মণি সিংহ	কমিউনিস্ট পার্টি
৪	সদস্য	অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ	ন্যাপ (মস্কোপন্থি)
৫	সদস্য	মনোরঞ্জন ধর	কংগ্রেস
৬	সদস্য	ক্যাপ্টেন মনসুর আলী	আওয়ামী লীগ
৭	সদস্য	এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান	আওয়ামী লীগ
৮	সদস্য	খন্দকার মোশতাক আহমেদ	মুজিবনগর সরকার

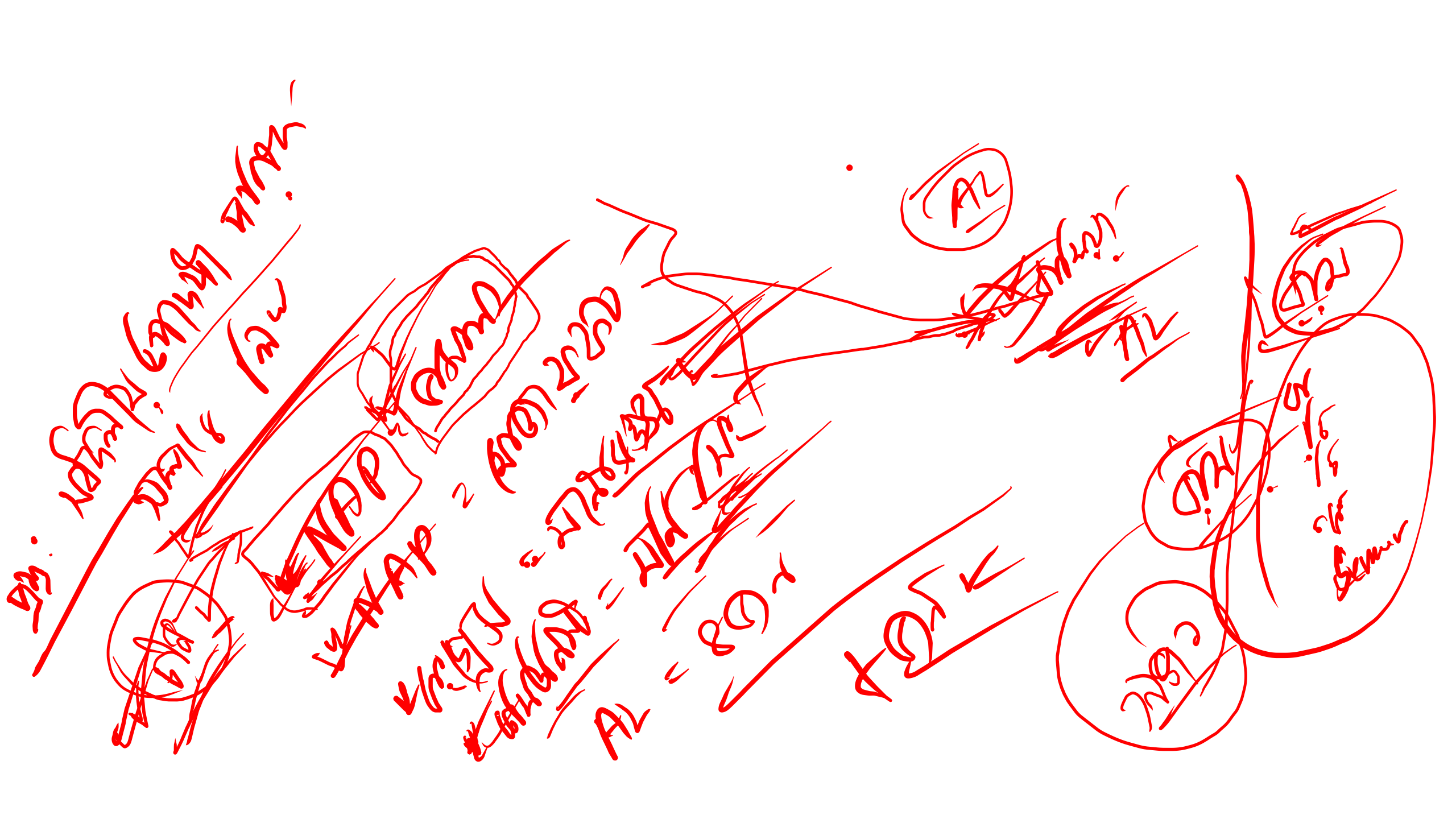

মুজিবনগর সরকার গঠন ও কার্যাবলি

মুজিবনগর সরকারের কার্যাবলি

মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল ১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদেরকে নিয়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। কার্যক্রমের মূল ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ-

মুক্তাঞ্চলে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও ট্রেনিং প্রদান

পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন দেশের অভ্যন্তরে ছাত্র যুবকদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছিলো তখন মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ায় তারা আশার আলো দেখতে পায়। দলে দলে তারা ভারতে এবং বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে চলে যায়। মুজিবনগর সরকার মুক্তাঞ্চলে এবং বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতীয় এলাকায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে। এখানে তাদেরকে সামরিক ট্রেনিং দেওয়া হয়। পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ভারতীয় বাহিনী এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দ্বারা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা

মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে (মুক্তিবাহিনী) কয়েকটি সেক্টরে বিভক্ত করে যুদ্ধ পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দেয়। মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালিত করা, মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ঠিক রাখা এবং বিভিন্ন সেক্টর ও গেরিলা বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব মুজিবনগর সরকার নিষ্ঠার সাথে পালন করেছিল।

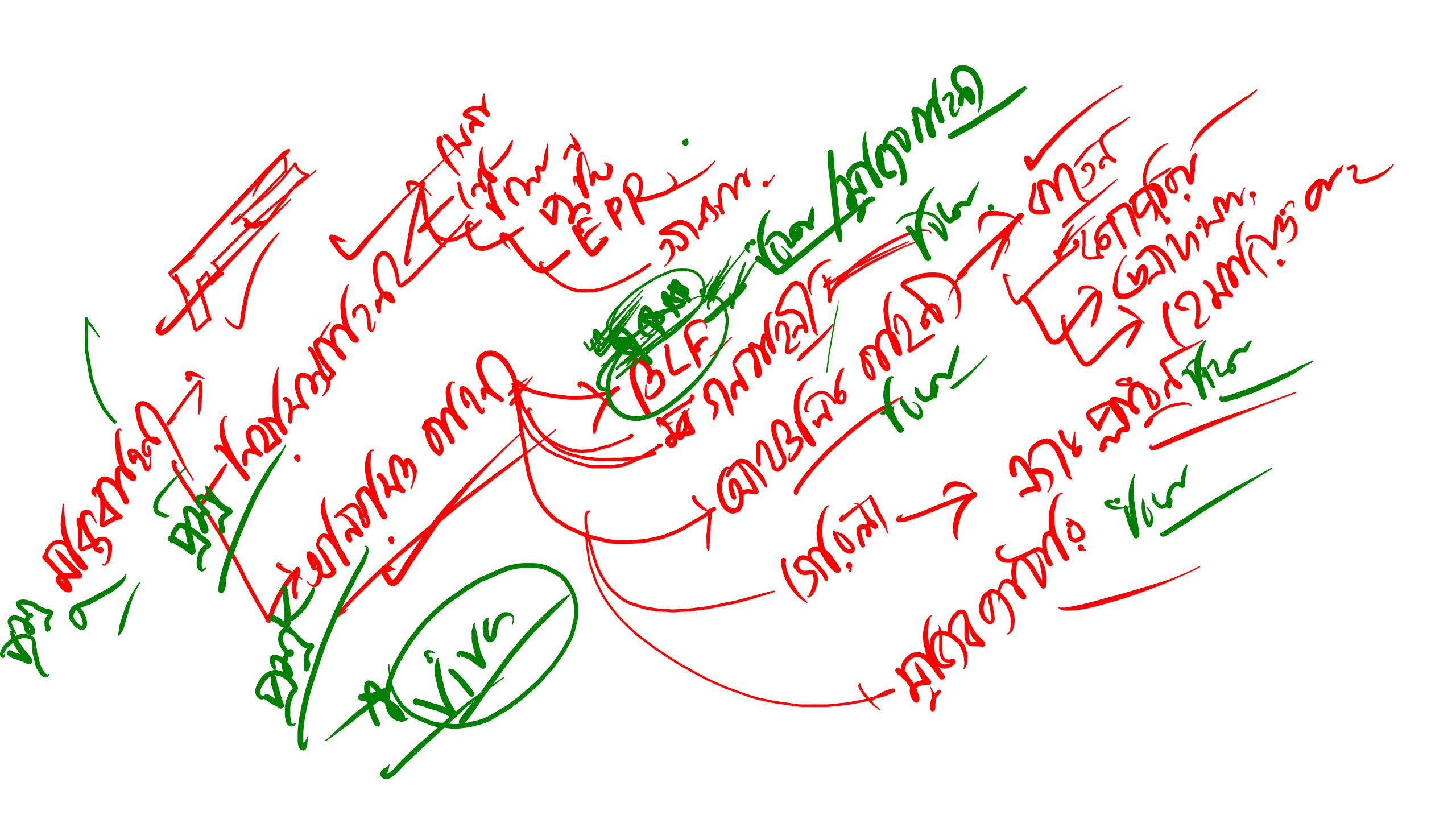

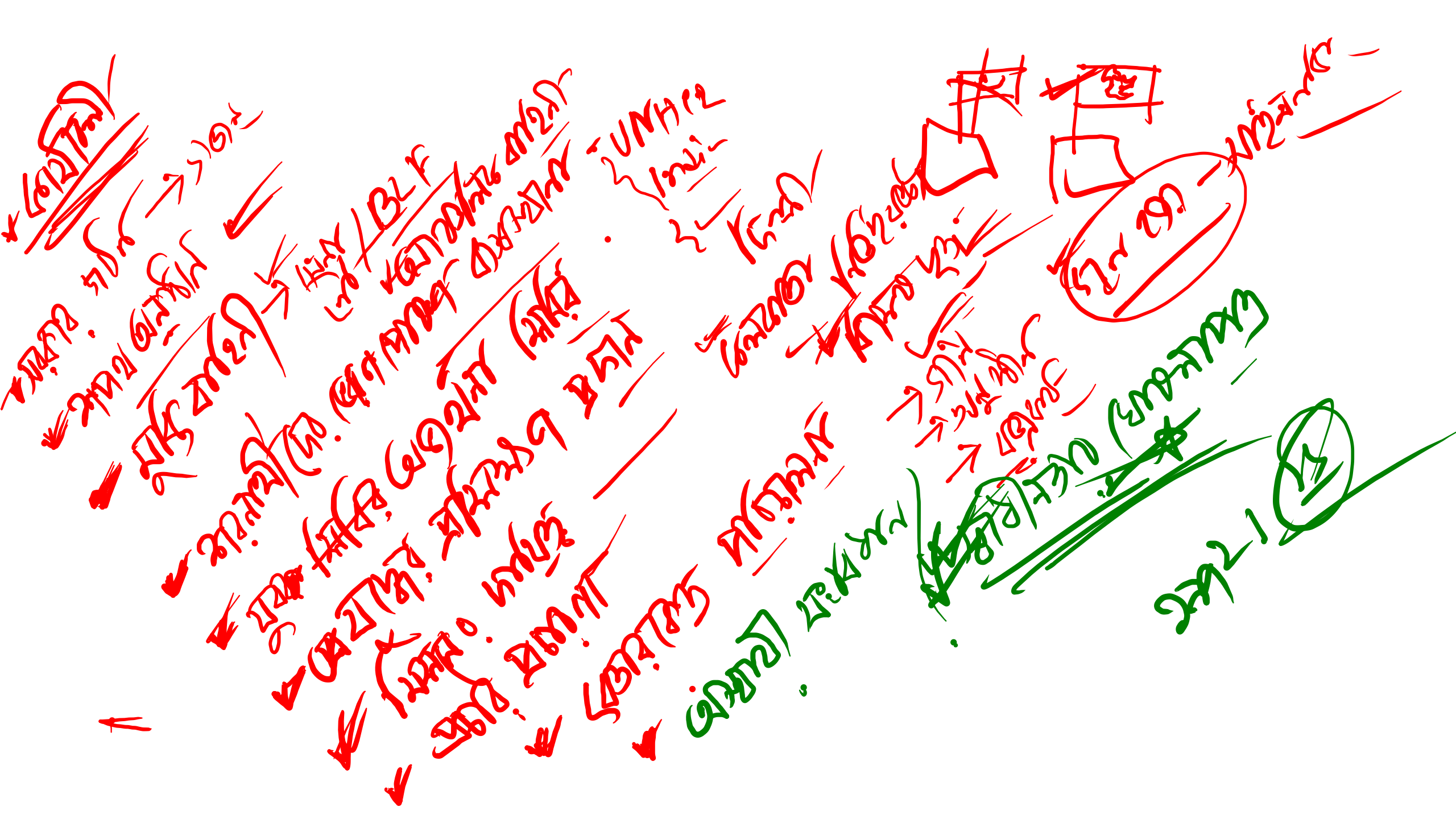

মুজিবনগর সরকার গঠন ও কার্যাবলি

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচার

জনগণের মনোবল ঠিক রাখার জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মুজিবনগর সরকার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালায়। স্বাধীন বাংলা বেতারের দেশাত্মবোধক গানগুলো এবং 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানটি মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল।

বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা

মুজিবনগর সরকার নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও একটি বেসামরিক প্রশাসন গড়ে তুলেছিল।

স্বাধীনতা বিরোধী আন্তর্জাতিক চক্রান্ত প্রতিরোধ

মুক্তিযুদ্ধকে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য আন্তর্জাতিক চক্রান্ত চালানো হয়েছিল। মুজিবনগর সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সুযোগ্য নেতৃত্ব সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেয়।

বহির্বিশ্বে প্রচার

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হিংস্রতা ও গণহত্যা, মুক্তিবাহিনীর সাফল্য ইত্যাদি বহির্বিশ্বে প্রচার করে জনমত সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকার প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল তৎকালীন সিলেটের (বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার) তেলিয়াপাড়ায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্, আনসার ও পুলিশবাহিনীর উচ্চপদস্থ বাঙালি সদস্যরা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এক সম্মিলিত অবস্থানের পরিকল্পনা করেন। সকলে একমত হয়ে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সাংগঠনিক নাম বা পরিচয় নির্ধারণ করেন 'মুক্তিবাহিনী' বা 'মুক্তিফৌজ'। সরকারিভাবে তাদের নাম রাখা হয় 'নিয়মিত বাহিনী'। এ সভাতেই মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণকারী বাহিনী সম্পর্কিত সাংগঠনিক ধারণা এবং কমান্ড কাঠামোর রূপরেখা প্রণীত হয়। পরবর্তীতে ১১ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে 'বাংলাদেশ বাহিনী' গঠন করা হয়। মুক্তিবাহিনী সরকারি পর্যায়ে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল নিয়মিত ও অনিয়মিত।

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

মুক্তিবাহিনী গঠন (স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী)

সেনাবাহিনী

পাক-হানাদার বাহিনী প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে গণহত্যা, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশে ত্রাস সৃষ্টি করে। পাক-হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস, ও অন্যান্য দালালরা অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে একের পর এক গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের পাশবিক অত্যাচার ও নির্যাতনের ফলে দলে দলে ছাত্র, যুবক এবং সাধারণ জনগণ ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে মাতৃভূমিকে হানাদারমুক্ত করার জন্য তারা মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মুক্তাঞ্চলগুলোতে বেসামরিক প্রশাসনের পাশাপাশি যুদ্ধ পরিচালনায় সামরিক সেক্টর গড়ে তোলা হয়। ফলে মুক্ত এলাকাগুলোতে হাজার হাজার ছাত্র এবং যুবকদেরকে প্রয়োজনীয় সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীকে উচ্চতর ট্রেনিং প্রদানের জন্য প্রথম দিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জোয়ানদের দ্বারা মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সেনাকর্মকর্তা, সেনাসদস্য, ইপিআর, পুলিশ, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যগণ মুজিবনগর সরকারে যোগদান করে। ফলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পায়। তখন সামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দ্বারা মুক্তিবাহিনীকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

বিমান বাহিনী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকারকে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ নিয়োগ করে। তিনি ছিলেন বিমান বাহিনীর সিনিয়র কর্মকর্তা। তিনি প্রবাসী সরকারের নির্দেশনায় ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর 'বাংলাদেশ বিমান বাহিনী' গঠন করেন। ১৮ জন পাইলট এবং ৭০ জন বৈমানিক নিয়ে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী। ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রদত্ত একটি অটার, একটি অলওয়েট হেলিকপ্টার এবং একটি ডিসি-৩ ডাকোটা বিমান দিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী যাত্রা শুরু করে।

পাইলটের মধ্যে ছিলেন স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বদরুল আলম, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন আকরাম এবং এয়ারফোর্সের প্রায় ৭০ জন টেকনিশিয়ান। ৩ ডিসেম্বর রাত দুটোর সময় একই সময়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী চট্টগ্রাম বন্দরের নিকটবর্তী অয়েল ডাম্প এবং নারায়ণগঞ্জের কাছে গোদনাইলে বিমান হামলা চালায় এবং এ হামলা খুবই কার্যকর হয়েছিল। এটি 'অপারেশন কিলো ফ্লাইট' নামে পরিচিত। এরা মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীকে সহায়তা দিয়েছিল। বিমান বাহিনীর সদস্য হলেও তারা অনেক সময় স্থলবাহিনীর সদস্যদের পাশে দাঁড়িয়ে স্থল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে, অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে বড় ধরনের ৪৫টি অভিযান চালায়। এসব অভিযানে পাকিস্তান নৌবাহিনীর ১২৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া হয়। সেপ্টেম্বরের পর চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে (মোংলা বন্দর) বিদেশি কোনো জাহাজ ভিড়তে রাজি হয়নি। এর ফলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অস্ত্র ও রসদের সরবরাহ দ্রুত ফুরিয়ে যেতে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

বাংলাদেশ নৌবাহিনী

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অধীনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্ম হয়। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে ঐতিহাসিক সেক্টর কমান্ডারদের কনফারেন্সের ঘোষণা মোতাবেক বাংলাদেশ নৌবাহিনী আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙালি অফিসার ও নাবিকগণ পশ্চিম পাকিস্তান ত্যাগ করে দেশে এসে বাংলাদেশ নৌবাহিনী গঠন করেন। ভারত থেকে প্রাপ্ত 'পদ্মা' (নৌ বাহিনীর প্রথম রণতরী) ও 'পলাশ' নামের ছোট দুটি গানবোট এবং ৪৯ জন নাবিক নিয়ে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট পরিচালিত নৌ-কমান্ডো বাহিনীর প্রথম অভিযান 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে পরিচিত। এদিন রাতে নৌ-কমান্ডোরা একযোগে মোংলা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ বন্দর আক্রমণ করে এবং পাকিস্তান বাহিনীর ২৬ টি পণ্য ও সমরাস্ত্রবাহী জাহাজ ও গানবোট ডুবিয়ে দেয়। ১৯৭১ সালের ৯ নভেম্বর অকুতোভয় নৌ–কমান্ডোরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিকট থেকে ৬টি নৌযান দখল করে নেয় এবং এগুলো দিয়েই ৯ নভেম্বর 'বঙ্গবন্ধু' নামক নৌবহরের উদ্বোধন করা হয়। নৌবাহিনীর অপারেশনের মধ্যে হিরণ পয়েন্টের মাইন আক্রমণ (১০ নভেম্বর,'৭১), মার্কিন ও ব্রিটিশ নৌযান ধ্বংস (১২ নভেম্বর,'৭১), চালনা (মোংলা বন্দরের পূর্ব নাম) বন্দরে নৌ হামলা (২২ নভেম্বর,'৭১), চট্টগ্রাম নৌ অভিযান (৫ ডিসেম্বর,'৭১), পাকিস্তান নৌ ঘাঁটি পিএনএস তিতুমীর অভিযান (১০ ডিসেম্বর,'৭১) উল্লেখযোগ্য। ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার রুহুল আমিন (বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন) 'পলাশ'– এর উপরে পাকিস্তানি জাহাজ থেকে ছোড়া বোমা বর্ষণে শহিদ হন। মহান মুক্তিযুদ্ধে নৌবাহিনীর দুঃসাহসিক অভিযানে শত্রুপক্ষ নৌ পথে দিশেহারা হয়ে পড়ে। মহান মুক্তিযুদ্ধে বহুসংখ্যক নৌ সদস্য শাহাদত বরণ করেন। জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধে নৌবাহিনীর ভূমিকাকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

[illegible]

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

এলাকা: রংপুর ও ঠাকুরগাঁও
কমান্ডার: উইং কমান্ডার এম.কে. বাশার।
সাব সেক্টর: ৫টি

এলাকা: রাজশাহী ও দিনাজপুর।
কমান্ডার: মেজর নাজমুল হক ও মেজর কাজী নূরুজ্জামান।
সাব সেক্টর: ৮টি

এলাকা: কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, যশোর ও খুলনা।
কমান্ডার: মেজর আবু ওসমান চৌধুরী ও মেজর এম. এ. মঞ্জুর।
সাব সেক্টর: ৭টি

এলাকা: সাতক্ষীরা, বরিশাল ও পটুয়াখালী
কমান্ডার: মেজর আবদুল জলিল ও মেজর জয়নাল আবেদীন।
সাব সেক্টর: ৩টি।

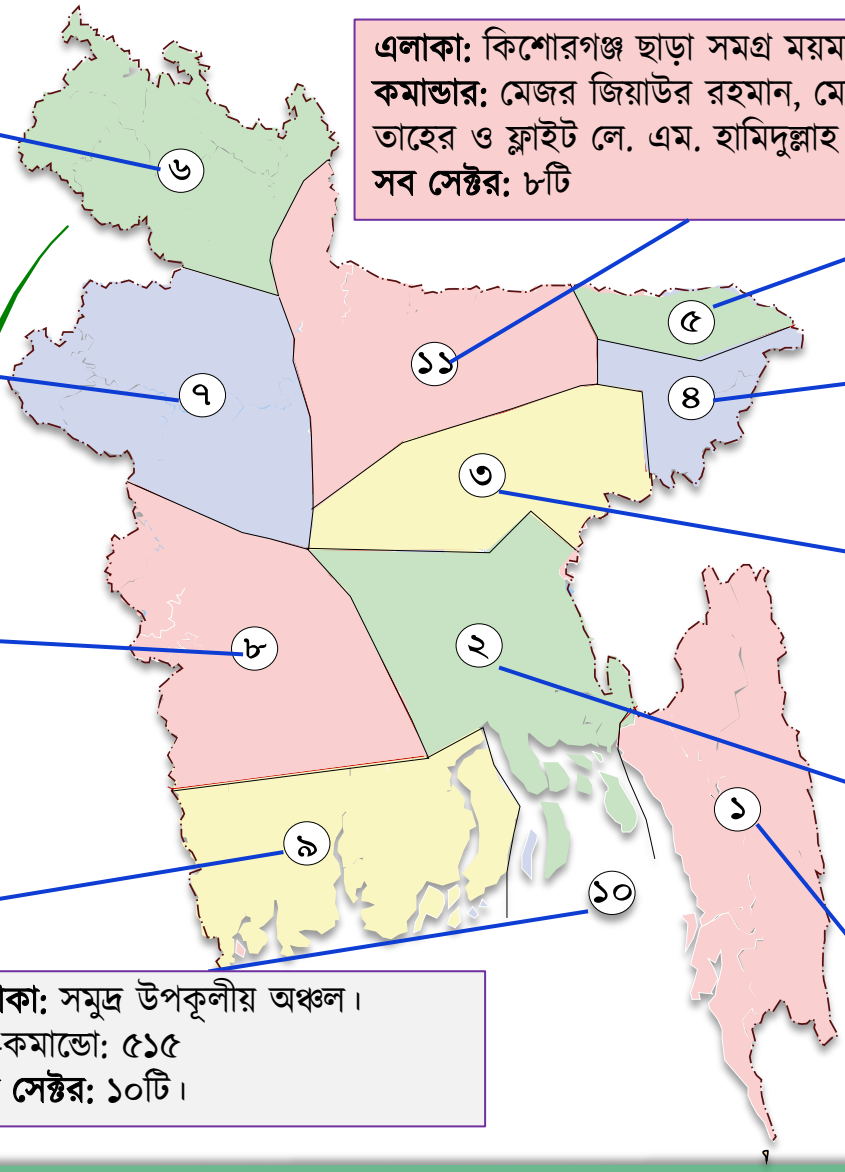

এলাকা: কিশোরগঞ্জ ছাড়া সমগ্র ময়মনসিংহ।
কমান্ডার: মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর আবু তাহের ও ফ্লাইট লে. এম. হামিদুল্লাহ।
সব সেক্টর: ৮টি

এলাকা: সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল।
নৌ-কমান্ডো: ৫১৫
সাব সেক্টর: ১০টি।

এলাকা: সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল, সুনামগঞ্জ।
কমান্ডার: মেজর মীর শওকত আলী।
সাব সেক্টর: ৬টি

এলাকা: সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল।
কমান্ডার: মেজর সি. আর. দত্ত।
সাব সেক্টর: ৬টি।

এলাকা: হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ।
কমান্ডার: মেজর কে. এম শফিউল্লাহ ও মেজর নুরুজ্জমান।
সাব সেক্টর: ১০টি

এলাকা: নোয়াখালী, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেল লাইন পর্যন্ত; ঢাকা ও ফরিদপুরের অংশবিশেষ।
কমান্ডার: মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর এ.টি.এম. হায়দার।
সাব সেক্টর: ৬টি।

এলাকা: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ফেনী নদী পর্যন্ত।
কমান্ডার: মেজর জিয়াউর রহমান ও মেজর রফিকুল ইসলাম।
সাব সেক্টর: ৫টি।

প্রশ্ন: ৭৩ম বাক্যটি কী।

Vivek

উত্তর: শ্রী দুই (প্রশ্নের) উত্তর দাও

Vivc

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

ব্রিগেড ফোর্স

১১টি সেক্টর ও ৬৪টি সাবসেক্টর ছাড়াও রণাঙ্গন তিনটি বিগ্রেড ফোর্সে বিভক্ত করা হয়। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিনায়কের নামের আদ্যাক্ষরের ভিত্তিতে ১৯৭১ সালের জুলাই, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে তিনটি নিয়মিত ব্রিগেড ফোর্সে গঠন করা হয়।

জেড - ফোর্স

সদর দপ্তর : তেলঢালা

অধিনায়কঃ লে. ক. জিয়াউর রহমান

মুক্তিবাহিনীর প্রথম ব্রিগেড জেড ফোর্স ৭ জুলাই, ১৯৭১ গঠিত হয়। লে. কর্নেল জিয়াউর রহমানের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয় 'জেড ফোর্স'। তিনটি নিয়মিত বাহিনী প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ন- এর সমন্বয়ে এই ফোর্স গঠিত হয়।

এস - ফোর্স

সদর দপ্তর : হাজামারা

অধিনায়কঃ লে. ক. কে এম শফিউল্লাহ

সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় ও একাদশ ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ন নিয়ে এস ফোর্স গঠিত হয়। লে. কর্নেল শফিউল্লাহ- এর নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয়।

কে - ফোর্স

সদর দপ্তর : আগরতলা

অধিনায়কঃ লে. ক. খালেদ মোশারফ

চতুর্থ, নবম ও দশম ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ন নিয়ে ৭ অক্টোবর কে- ফোর্স গঠিত হয়। লে. ক. খালেদ মোশারফ- এর নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয়। ২১ অক্টোবর লে. কর্নেল খালেদ মোশারফ গুরুতরভাবে আহত হলে মেজর খালেক চৌধুরী ব্রিগেডের দায়িত্ব নেন।

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

❖ মুজিব বাহিনী/বিএলএফ

- BLFএর পূর্ণরূপ হল 'Bangladesh Liberation Front'. একে 'মুজিব বাহিনী ও বলা হয়।
- এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নির্দিষ্টভাবে বাছাই করা কিছু তরুণ ও যুবককে নিয়ে।
- মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় বাহিনীর মেজর জেনারেল ওবান। মুজিব বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার।

❖ মুজিব ব্যাটারী

- স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামানুসারে ২২ জুলাই ১৯৭১ ভারতের ত্রিপুরার কোনাবন অঞ্চলে গঠন করা হয় মুজিব ব্যাটারী।
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম আর্টিলারি/ গুলন্দাজ ইউনিট মুজিব ব্যাটারী। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৬টি কামান নিয়ে গঠিত এই বাহিনী ২নং সেক্টরে যুদ্ধ করে।
- এগুলো ১৯৪২-১৯৪৬ সালের মধ্যে ভারতে প্রস্তুত করা হয়। এ ধরনের কামান সর্বপ্রথম ১৯২০ সালে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীতে যুক্ত হয়। অক্টোবর ১৯৭১, K ফোর্স গঠিত হলে মুজিব ব্যাটারি K ফোর্সের সঙ্গে যুক্ত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

❖ মুক্তিফৌজ

বাঙালি সামরিক অফিসার ও সৈন্যদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত বাহিনী। এদের বলা হত মুক্তিফৌজ। ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল ওসমানীর নেতৃত্বে হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে ৫ হাজার সামরিক এবং ৮ হাজার বেসামরিক সদস্য নিয়ে "মুক্তিফৌজ" গঠিত হয়। ১১ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার হওয়ার পর মুক্তিফৌজ ও মুক্তিসেনাদের নাম পরিবর্তন করে মুক্তিবাহিনী করা হয়।

❖ মিত্রবাহিনী/যৌথ বাহিনী

২১ নভেম্বর ১৯৭১, বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী এবং ভারতের সেনাবাহিনী মিলে যৌথবাহিনী গঠন করে যা মিত্রবাহিনী নামে পরিচিত। মিত্র বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন-ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার মেজর জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। মিত্র বাহিনী প্রধান ছিলেন ভারতের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল শ্যাম মানেকশ।

❖ মিত্রবাহিনী

যৌথ কমান্ডের প্রধান ও ভারতের সেনাপ্রধান	ফিল্ড মার্শাল শ্যাম জামসেদজি মানেকশ
যৌথ কমান্ডের অধিনায়ক ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার	লে. জে জগজিৎ সিং অরোরা
ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডর চিফ অব স্টাফ	লে. জে জ্যাক ফার্জ রাফায়েল জ্যাকব

[illegible] : [illegible] — [illegible]

[illegible] : [illegible] ② — [illegible] : [illegible]

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

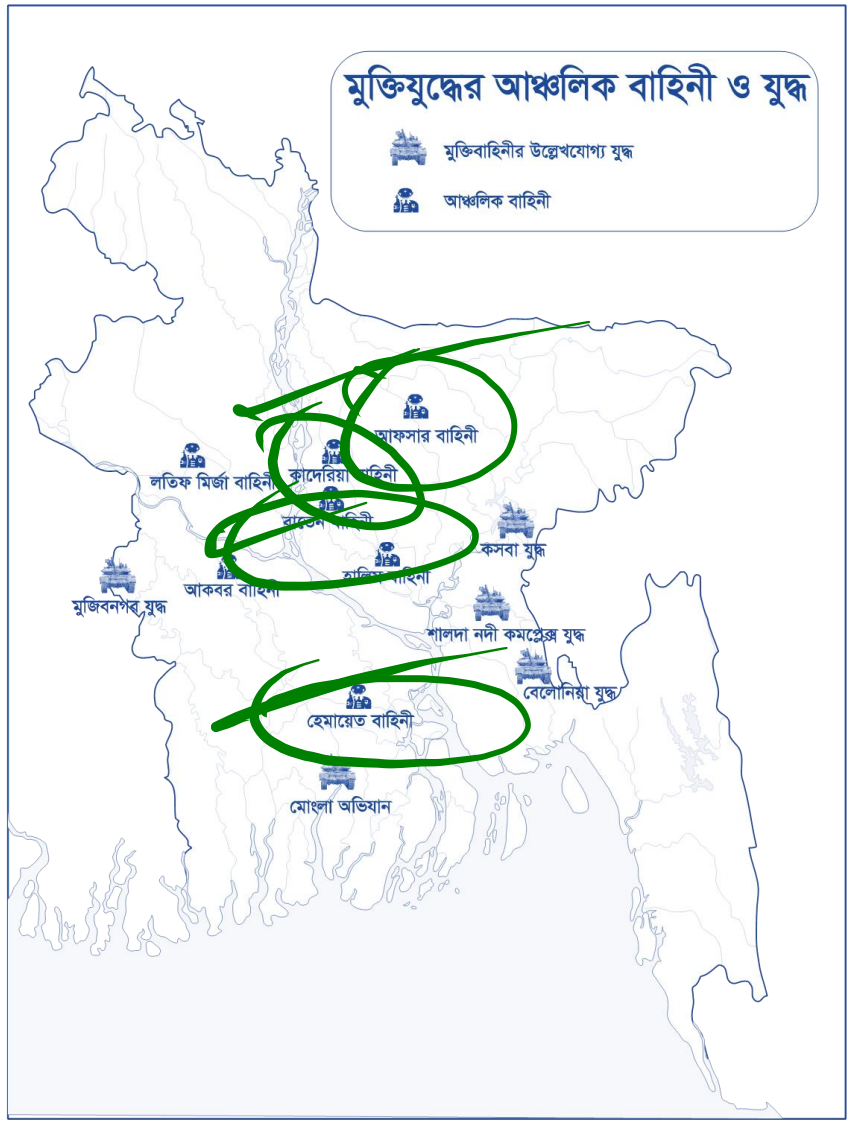

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

নৌ: অপারেশন জ্যাকপট

মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বিখ্যাত অভিযানটির নাম অপারেশন জ্যাকপট। ১৯৭১ সালের ১৫ অগাস্ট মধ্যরাতের অন্ধকারে চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর এবং নারায়নগঞ্জ ও চাঁদপুর নদীবন্দরে একযোগে পরিচালিত হয়। সম্মিলিত এই অপারেশনে প্রায় ৫০ হাজার টন জাহাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় যার মধ্যে এমভি হরমুজ ও এমভি আল আব্বাস অন্যতম। শুধু এই জাহাজ দুটিতেই ২০ হাজার টনের বেশি সমরাস্ত্র ছিল।

পাকিস্তান নেভির পক্ষে ফ্রান্সে ট্রেইনিং করতে থাকা ৮ জন বাংলাদেশি সাবমেরিনার যুদ্ধের খবর শুনে দল পালিয়ে দেশে আসেন। ভারতে গেরিলা ট্রেনিং শেষে এদের নেতৃত্বে একটি নৌ কমান্ডো গঠন করা হয়। এই কমান্ডোর কাছেই জ্যাকপটের দায়িত্ব এসে পড়ে।

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে শক্তির পার্থক্য কমানোর জন্য সাপ্লাই চেইন ভেঙে দেওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু, যুদ্ধের মধ্যেও পাকিস্তান তো বটেই, বিদেশি জাহাজগুলোও বন্দরে এসে ভিড়ছিল। জ্যাকপটের মূল লক্ষ্য ছিল এই বন্দরগুলোকে অনিরাপদ করে তোলা যাতে করে রসদ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়।

আত্মঘাতী কৌশলে পরিচালিত এ অপারেশনে চারটি দল অংশ নিয়েছিল। সবচেয়ে বড় দলটি ২৬০ জন সদস্যের ছিল যাদের কাজ ছিল চালনা (মোংলা) বন্দরকে অকেজো করে দেওয়া। চট্টগ্রাম দলে ৬০ জন ও নদীবন্দরের দলগুলোতে ২০জন করে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আকাশবাণী বেতারে প্রচারিত দুইটি গানের মাধ্যমে দলগুলো সময়ের সমন্বয় করেছিল। নির্ভয় মুক্তিযোদ্ধারা ডুবসাঁতারে জাহাজগুলোর কাছে গেছেন, মাইন স্থাপন করে আবার ডুবসাঁতারে ফিরে এসেছেন। দুঃসাহসী এই অভিযানে ৮ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন।

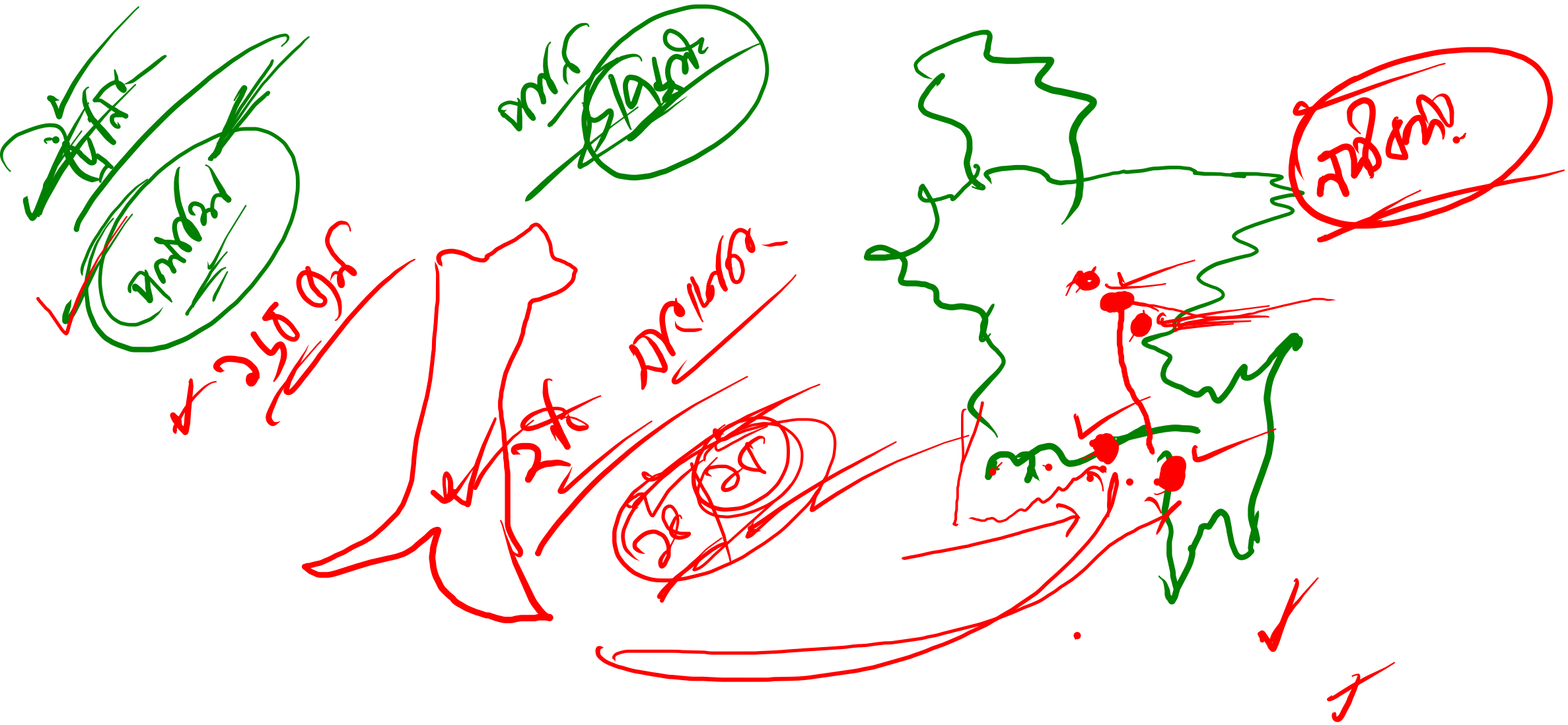

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

বিমান: কিলো ফ্লাইট

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বম্বিং অপারেশনের সাংকেতিক নাম "কিলো ফ্লাইট"। একটি ডিএইচসি -৩ অটার বিমান এবং একটি অ্যালুয়েট-৩ হেলিকপ্টার নিয়ে গঠিত হয়েছিল এই দুঃসাহস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের বিমান দিয়েই মুক্তিযুদ্ধে কিলো ফ্লাইট প্রতিপক্ষের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছিল।

১৯৭১ এর সেপ্টেম্বরে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে খন্দকারের নেতৃত্বে ৯ জন বাঙালি পাইলট এবং ৫৮ জন প্রাক্তন পাকিস্তান এয়ার ফোর্স সদস্যদের নিয়ে এই ইউনিট গঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সূচনাও এইটাই। মুক্তিযুদ্ধে বিমান স্ট্রাইক অপারেশন পরিচালনার ট্রেইনিং দেওয়া হয়েছিল নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর বেস থেকে। কিলো ফ্লাইট পরিচালিত হতো আসামের ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স বেস জোড়হাট থেকে। মিত্রবাহিনী গঠনের পর কিলো ফ্লাইটের মুক্তিযোদ্ধারা অসীম সাহসে দেশজুড়ে শত্রুসেনাদের ওপর এয়ারস্ট্রাইক অপারেশন পরিচালনা করেন। এসব অপারেশনের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের তেল ডিপো ধ্বংস করতে পারা মুক্তিযুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইটের শুরু থেকে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার লক্ষ্যে এদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়। ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ থেকে যৌথ বাহিনীর আক্রমণের ফলে পাকিস্তানের পরাজয় যখন নিশ্চিত তখন তারা বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার নীল নকশা তৈরি করে। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী আলবদর ও আল-শামসের সহায়তায় বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, সঙ্গীতজ্ঞদের ধরে নিয়ে নির্মম নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চ থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, শহীদুল্লা কায়সার, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, চিকিৎসক ডা. ফজলে রাব্বী ও ডা. আলিম চৌধুরী, সাংবাদিক নিজামউদ্দিন ও সিরাজউদ্দিন হোসেন, দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা, নৃতন চন্দ্র সিংহ, রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মশিউর রহমান, লেখিকা সেলিনা পারভীন ও মেহেরুন্নেসা, সাহিত্যিক শহিদ সাবের ও আনোয়ার পাশা, সঙ্গীতজ্ঞ আলতাফ মাহমুদের মতো বরেণ্য ব্যক্তিগণ।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ১৪ ডিসেম্বর। বিজয় অর্জনের পরে এসব সূর্য সন্তানদের লাশ রায়ের বাজারসহ বিভিন্ন বধ্যভূমিতে পাওয়া যায়। এই অপরাধের দায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশি দোসর রাজাকার, আলবদর, আল-শামস বাহিনীর উপর বর্তায়। এই পরিকল্পিত গণহত্যা চালাতে গিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা এদেশে অনেক বধ্যভূমি তৈরি করেছে। এর মধ্যে কয়েকটি বড় বধ্যভূমি হলো ঢাকার রায়েরবাজার, চট্টগ্রামের পাহাড়তলি, খুলনার খালিশপুর, সিলেটের শমসেরনগর ইত্যাদি। সারাদেশে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় নির্জন নদীতীর ও চা বাগানেও অসংখ্য বধ্যভূমি গড়ে তুলেছিল ঘাতকরা।

পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের মিত্র আল বদর বাহিনী বাঙালির তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে এক কলঙ্কময় ইতিহাসের সৃষ্টি করে। প্রতিবছর ১৪ ডিসেম্বর 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে পালিত হয়। বুদ্ধিজীবীদের স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ সালে ঢাকার ৫টি সড়কের নাম ১৯৭১ সালে হত্যাকাণ্ডের শিকার বুদ্ধিজীবীদের নামে রাখা হয়।

বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয়লাভ ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ

যৌথবাহিনীর পক্ষে	পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পক্ষে
জগজিৎ সিং অরোরা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চীফ ভারত-বাংলাদেশ বাহিনী পূর্ব রণাঙ্গন ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১	**আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজি** লেফটেন্যান্ট জেনারেল সামরিক আইন প্রশাসক জোন-টি এবং কমান্ডার ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয়লাভ ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ

আত্মসমর্পণ দলিলের তাৎপর্য গুরুত্ব

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে। এদিন পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ এবং অস্ত্র সমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো উল্লেখ রয়েছে 'Instrument of Surrender' নামক দলিলে। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্ববহ নানাবিধ কারণে।

এই দলিল স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ড লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার নির্দেশের অধীন হবে। নির্দেশ না মানলে, তা আত্মসমর্পণের শর্তের লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে, এবং তার প্রেক্ষিতে যুদ্ধের স্বীকৃত আইন ও রীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আত্মসমর্পণের শর্তাবলির অর্থ অথবা ব্যাখ্যা নিয়ে কোনো সংশয় দেখা দিলে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত।

প্রশ্ন: তোমাদের [illegible]?
[illegible]

তোমার: [illegible]: [illegible]
[illegible] (২) (৩)
[illegible]
[illegible]

বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয়লাভ ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ

লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা আত্মসমর্পণকারী সেনাদের জেনেভা কনভেনশনের বিধি অনুযায়ী প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান দেওয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করছেন, এবং আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি সামরিক ও আধা-সামরিক ব্যক্তিদের নিরাপত্তা ও সুবিধার অঙ্গীকার করছেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীন বাহিনীগুলোর মাধ্যমে বিদেশি নাগরিক, সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ও জন্মসূত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যক্তিদের সুরক্ষাও দেওয়া হবে।

এই দলিল বাংলাদেশের জন্য কয়েকটি কারণে বেশ গুরত্বপূর্ণ –

- ✓ এর মাধ্যমে হাজার বছরের বাঙালি পেল এক স্বাধীন ভূখণ্ড।
- ✓ স্বাধীনতার যুদ্ধে বাঙালির ত্যাগ ও সংগ্রামের লিখিত স্বীকৃতি।
- ✓ পাকিস্তান বাহিনীর পরাজয়ের লিখিত দলিল।
- ✓ পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী যাতে পরবর্তী সময়ে আবার রাজনৈতিক সমাধান খোঁজার চেষ্টা না করতে পারে তার বিরুদ্ধে দালিলিক প্রমাণ।
- ✓ বাংলাদেশের স্বাধীন দেশ হিসবে বিদেশে স্বীকৃতি লাভের একটি মাধ্যম।

সর্বোপরি, এই দলিল ঐতিহাসিকভাবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এক গৌরবের প্রতীক হয়ে থাকবে। তাদের কাছে সর্বদা অনুপ্রেরণার বস্তু হয়ে থাকবে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও তাদের পূর্বপুরুষদের বীরত্বের কথা।

মুক্তিযুদ্ধের খেতাব

❖ মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য নিম্নোক্ত খেতাব প্রদান করা হয়-

বীরত্বসূচক উপাধিসমূহ	১. বীরশ্রেষ্ঠ ৭ জন, ২. বীরউত্তম ৬৮ জন ৩. বীরবিক্রম ১৭৫ জন ৪. বীরপ্রতীক ৪২৬ জন
বিদেশি বন্ধুদের প্রদত্ত সম্মাননা	১. বাংলাদেশ স্বাধীনতা **সম্মাননা- ১ জন (ইন্দিরা গান্ধী)** ২. বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা- ১৫ জন ৩. বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মাননা- ৩১১ জন ও ১১টি সংগঠন
বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্তা নারী	১. ক্যাপ্টেন ডা. সেতারা বেগম বীরপ্রতীক (২নং সেক্টর) ২. তারামন বিবি বীরপ্রতীক (১১নং সেক্টর)
খেতাবপ্রাপ্ত নাগরিক আদিবাসী	ইউকে চিং (বীরবিক্রম)
মুক্তিবেটি নামে পরিচিত	কাকন বিবি

মুক্তিযুদ্ধের খেতাব

❖ খেতাব বাতিল

জাতির পিতার আত্মস্বীকৃত ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত চার খুনির মুক্তিযুদ্ধের খেতাব বাতিল করেছে সরকার। এ বিষয়ে ৬ জুন, ২০২১ সালে প্রজ্ঞাপন জারি করে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। যাদের খেতাব বাতিল করা হয়েছে– লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম (বীরউত্তম, গেজেট নং ২৫), লে. কর্নেল এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী (বীরবিক্রম, গেজেট নং ৯০), লে. এ এম রাশেদ চৌধুরী (বীরপ্রতীক, গেজেট নং ২৬৭) এবং নায়েক সুবেদার মোসলেম উদ্দিন খান (বীরপ্রতীক, গেজেট নং ৩২৯)।

অর্থাৎ, বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য খেতাবপ্রাপ্তদের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৭২ জনে:

✪ বীরশ্রেষ্ঠ – ৭ জন ✪ বীরউত্তম – ৬৭ জন ✪ বীরবিক্রম - ১৭৪ জন ✪ বীরপ্রতীক – ৪২৪ জন

বীরশ্রেষ্ঠ

❖ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

- **পিতা** – আবদুল মোতালেব হাওলাদার, মাতা- সাফিয়া বেগম
- **জন্ম** - ৮ মার্চ, ১৯৪৯, রহিমগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, বরিশাল
- **মৃত্যু**- ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১, বারঘরিয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- **কর্মস্থল ও সেক্টর** – সেনাবাহিনী, **সেক্টর -৭**
- **পদবী** - ক্যাপ্টেন

❖ হামিদুর রহমান

- **পিতা** – আব্বাস আলী মণ্ডল, মাতা- মোসাম্মৎ কায়সুন্নেসা
- **জন্ম** – ১৯৪৪, যশোর
- **মৃত্যু** – ২৮ অক্টোবর, ১৯৭১ ধলই, শ্রীমঙ্গল, সিলেট
- **কর্মস্থল ও সেক্টর** – সেনাবাহিনী, **সেক্টর ৪**
- **পদবী** – সিপাহী

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

হামিদুর রহমান

[illegible]

Army

Navy

Air

[illegible]

বীরশ্রেষ্ঠ

❖ মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

- **পিতা** – হাবিবুর রহমান, মাতা- মালেকা বেগম
- **জন্ম** – ১৯৪৭, দৌলতখান, ভোলা।
- **মৃত্যু** – ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ দরুইন, কুমিল্লা।
- **কর্মস্থল ও সেক্টর** – সেনাবাহিনী সেক্টর ২
- **পদবী** – সিপাহী

❖ মোহাম্মদ রুহুল আমিন

- **পিতা** – আজহার পাটোয়ারী, মাতা – জোলেখা খাতুন
- **জন্ম** – জুন ১৯৩৪, নোয়াখালী
- **মৃত্যু** – ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১
- **কর্মস্থল ও সেক্টর** – নৌ বাহিনী, সেক্টর – ৪
- **পদবী**- ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

মোহাম্মদ রুহুল আমিন

বীরশ্রেষ্ঠ

❖ মতিউর রহমান

- **পিতা** – মৌলভী আব্দুস সামাদ, মাতা- সৈয়দা মোবারকুন্নেসা খাতুন
- **জন্ম** – ২৯ অক্টোবর ১৯৪১, ১০৯ আগা সাদেক রোড, পুরান ঢাকা
- **মৃত্যু**- ২০ আগস্ট, ১৯৭১, করাচি বিমান ঘাঁটি, পাকিস্তান
- **কর্মস্থল ও সেক্টর** – বিমান বাহিনী
- **পদবী** – ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট

❖ মুন্সি আব্দুর রউফ

- **পিতা** – মুন্সি মেহেদী হাসান, মাতা – মকিদুন্নেসা
- **জন্ম** – ১ মে, ১৯৪৯, ফরিদপুর
- **মৃত্যু** – ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ মহালছড়ি, রাঙ্গামাটি
- **কর্মস্থল ও সেক্টর** – রাইফেলস, **সেক্টর ১**
- **পদবী** – ল্যান্স নায়েক

মতিউর রহমান

মুন্সি আব্দুর রউফ

বীরশ্রেষ্ঠ

❖ নূর মোহাম্মদ শেখ

- ➲ **পিতা** – মোহাম্মদ আমানত শেখ, মাতা – জেন্নাতুন্নেসা
- ➲ **জন্ম** – ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬, মহিষখোলা, নড়াইল
- ➲ **মৃত্যু** – ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, গোয়ালহাটি, যশোর
- ➲ **কর্মস্থল ও সেক্টর** – রাইফেলস, **সেক্টর ৮**
- ➲ **পদবী** – ল্যান্স নায়েক

ERR

নূর মোহাম্মদ শেখ

মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশ্ব

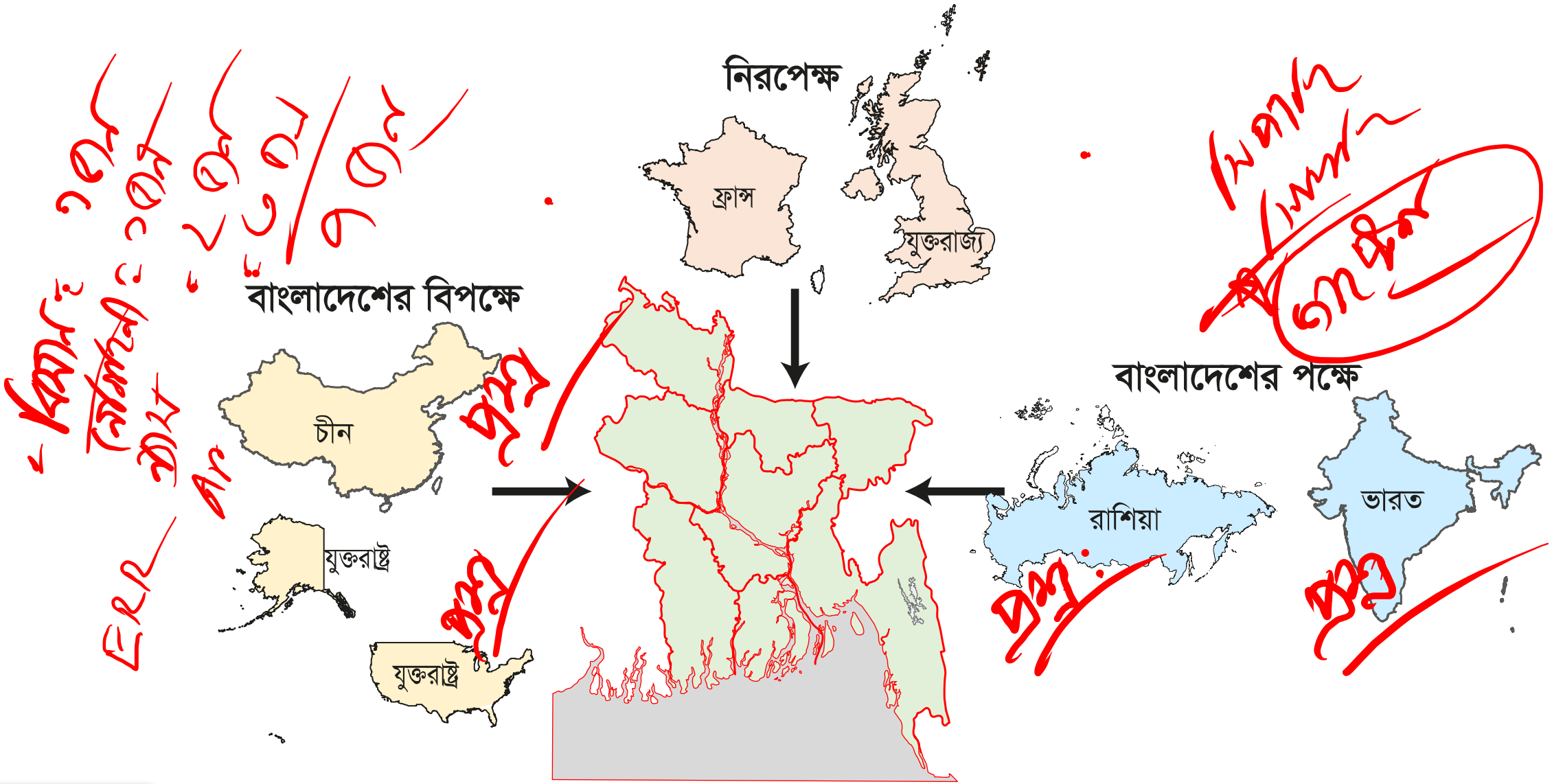

মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

সোভিয়েত ইউনিয়ন যে কারণে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিল

সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিল তা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই রুশ-ভারত মিত্রতা ও মার্কিন-পাকিস্তান মিত্রতা এবং রুশ-চীন ও ভারত-চীন বৈরীতার বিষয়টি স্মরণ রাখা দরকার । ষাটের দশকে পাকিস্তান চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সমানভাবে উন্নত সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু রুশ-চীন বিবাদের ফলে তা সম্ভব হয়নি। ১৯৬৯-এর দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন দক্ষিণ এশিয়া নিরাপত্তা জোটে সরাসরি অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু এই জোটটি চীন বিরোধী হওয়ায় পাকিস্তান জোটে যোগদানে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে পাকিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়নের সহানুভূতি হারায়। অন্যদিকে পাকিস্তানের মাধ্যমেই চীন-আমেরিকা সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ায় পাকিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাগভাজন হয়। সুতরাং ১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, তখন মস্কো-ইসলামাবাদ সম্পর্কের বেশ অবনতি ঘটেছিল। তবে তার মানে এই নয় যে, মস্কো পাকিস্তানকে মিত্ররাষ্ট্র হিসেবে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছিল। তার প্রমাণ ১৯৭০ সালেও দু'দেশের মধ্যে পাঁচশালা বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। আর এমনই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথমে সতর্কতামূলক এবং পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থনমূলক ভূমিকা পালন করেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থনের পিছনে নিম্নলিখিত কারণসমূহকে চিহ্নিত করা যায়।

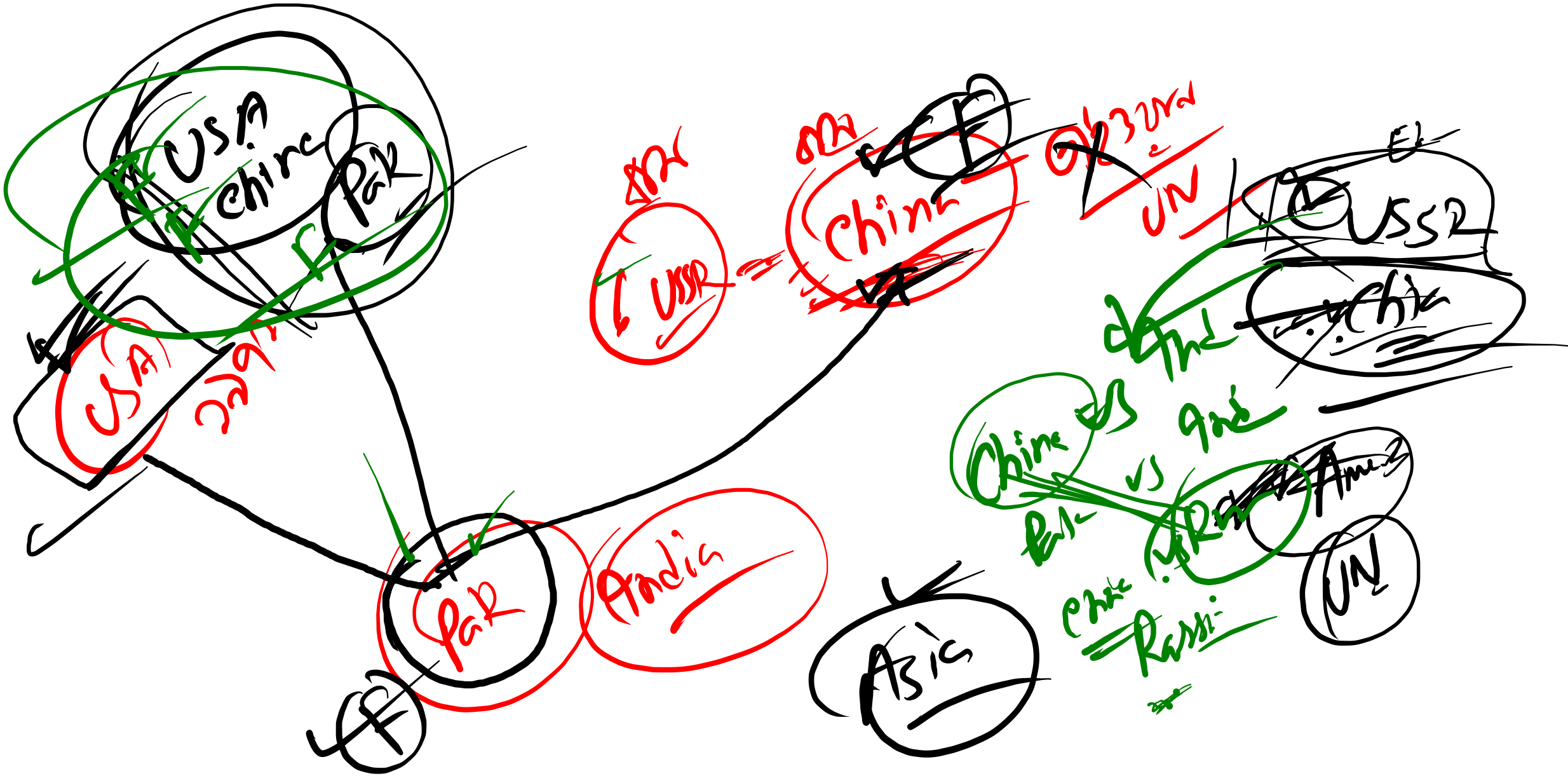

USA
Pak
USA
USSR
China
UN
Pak
India
Asia
UN

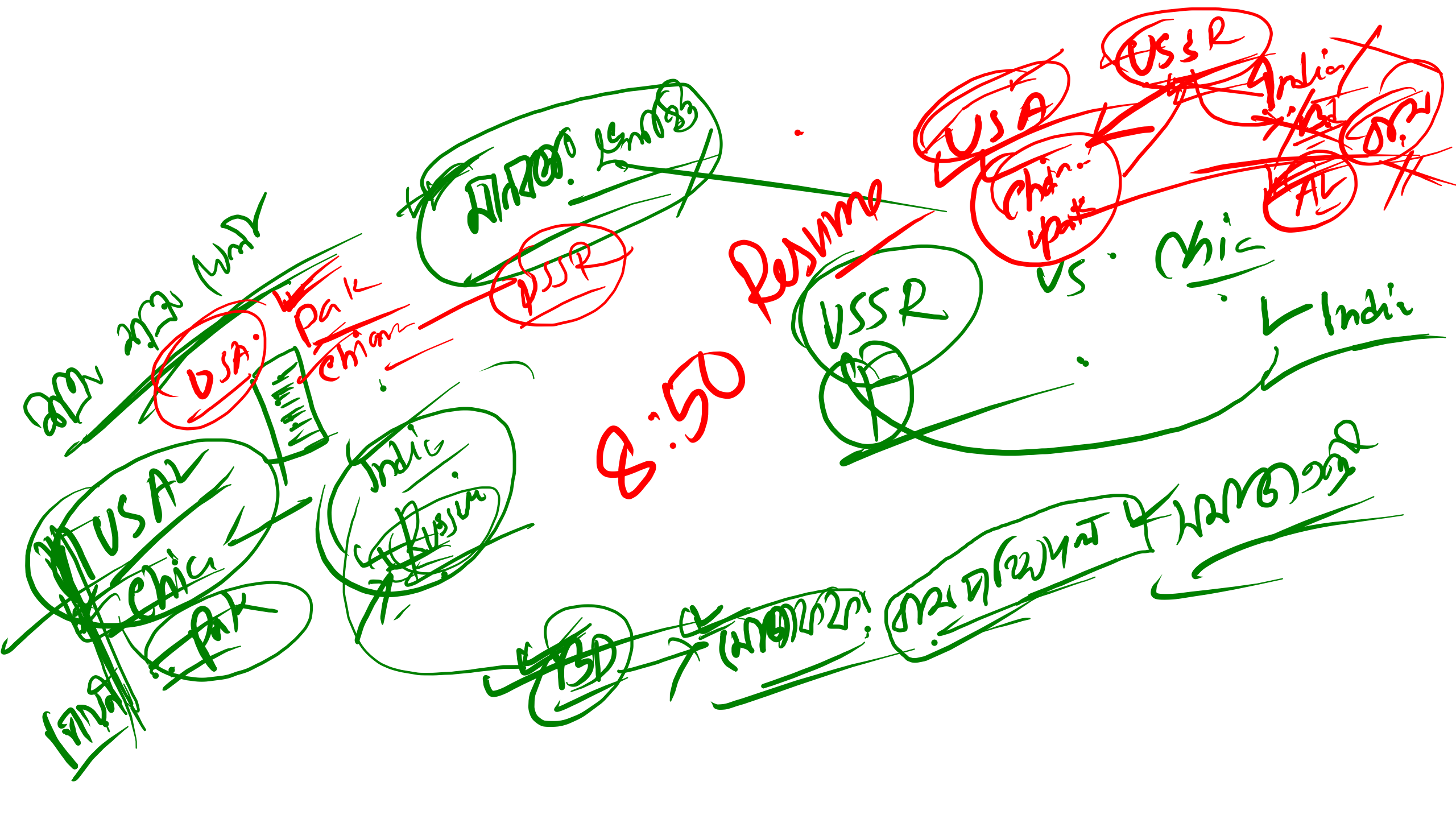

USA
Pak
USSR
Resume
8:50
USSR
India
Pak

মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসিয়ে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন: সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য কোন সময়ই পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় সত্তার বিরোধী ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানি সামরিক শাসকবর্গ ছিলেন অতিমাত্রায় ভারত বিরোধী ও চীন ঘেঁষা। তাই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ভারত ও মস্কো ঘেঁষা আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসাতে তৎপর হয়। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের ধারণা ছিল যে, পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে পাকিস্তান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে। কিন্তু ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান কর্তৃক সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালানোয় শুরু হয় বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। তাই এ যুদ্ধকে সমর্থন করা ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনো বিকল্প ছিল না।

ভারতের পূর্ব প্রান্তে বিপ্লবী চেতনার প্রসার রোধ করা: বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ক্রমে তা গণযুদ্ধে রূপ নেয়ার সম্ভাবনা ছিল। আর তা হলে আসাম সহ ভারতের পূর্ব প্রান্ত বিপ্লবী চেতনা ও বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ হতো- যা ভারতের জন্য হতো বিরাট বিপদের কারণ। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের লক্ষ্য ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুক্তিযুদ্ধের অবসান এবং সম্ভব হলে অখণ্ড পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আওয়ামী লীগকে স্থাপন করে সমস্যার সমাধান। আর এজন্যই পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন তৎপর হয়ে উঠেছিল।

মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

রুশ-চীন বিরোধ: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন করার অন্যতম কারণ হচ্ছে রুশ-চীন বিরোধ। সমাজতান্ত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও দু'দেশের মধ্যে চরম বৈরীতার সম্পর্ক ছিল। অবস্থাটা এমন ছিল যে, কোন একটি দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র হলে সে দেশটি চীনের শত্রুতে পরিণত হবে। আর এ কারণেই পাকিস্তান চীনের ঘনিষ্ঠ মিত্র হওয়ায় তা সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন মনেপ্রাণে চাচ্ছিল পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্ব অটুট রাখতে। কিন্তু চীন-পাকিস্তান মৈত্রী সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন বেকায়দায় পড়ে যায় এবং বাধ্য হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করতে। সুতরাং দেখা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বাঙালির প্রতি মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়, বরং নিজস্ব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও প্রভাব বলয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের বিবেচনায় খুব হতাশাব্যঞ্জক। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল অখণ্ড পাকিস্তান নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসে বাংলাদেশের সমর্থন ছিল খুবই শক্তিশালী এমনকি মার্কিন প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর ব্যতীত সরকারের অন্যান্য স্তরের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ছিল ব্যাপক সমর্থন। পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যম এবং জনমনে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ছিল প্রশ্নাতীত। আমেরিকার বাঙালি মহলও সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধে নানা ধরনের সহায়তা করে। এমনকি পাকিস্তানের কূটনৈতিক মিশনগুলোতে কর্মরত বাঙালিরা এক পর্যায়ে বাংলাদেশের পক্ষে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সর্বত্র আমেরিকানরা বাঙালিদের বন্ধু অথবা সাহায্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করে জনমত গঠন করে ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এবং শরণার্থী কেন্দ্রে বাঙালিদের নানা ধরনের সাহায্য করে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার সহ মার্কিন প্রশাসনের নীতি নির্ধারক মহল ব্যতীত পাকিস্তানের বর্বর হামলা ও অমানবিক কর্মকাণ্ডের সমর্থন আমেরিকার কোথাও তেমন দেখা যায়নি। মুক্তিযুদ্ধকালীন পুরো নয় মাস নিক্সন প্রশাসন পাকিস্তানের জন্য নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সমর্থন যুগিয়েছিল।

ศักดิ์

เรียง

แสงทราย:

ใจ:

- คุณภาพชีวิต
- ภาษา
- ไอเดีย
- ทุก[illegible]
- อาชีพเสริม[illegible]
- ความสุข

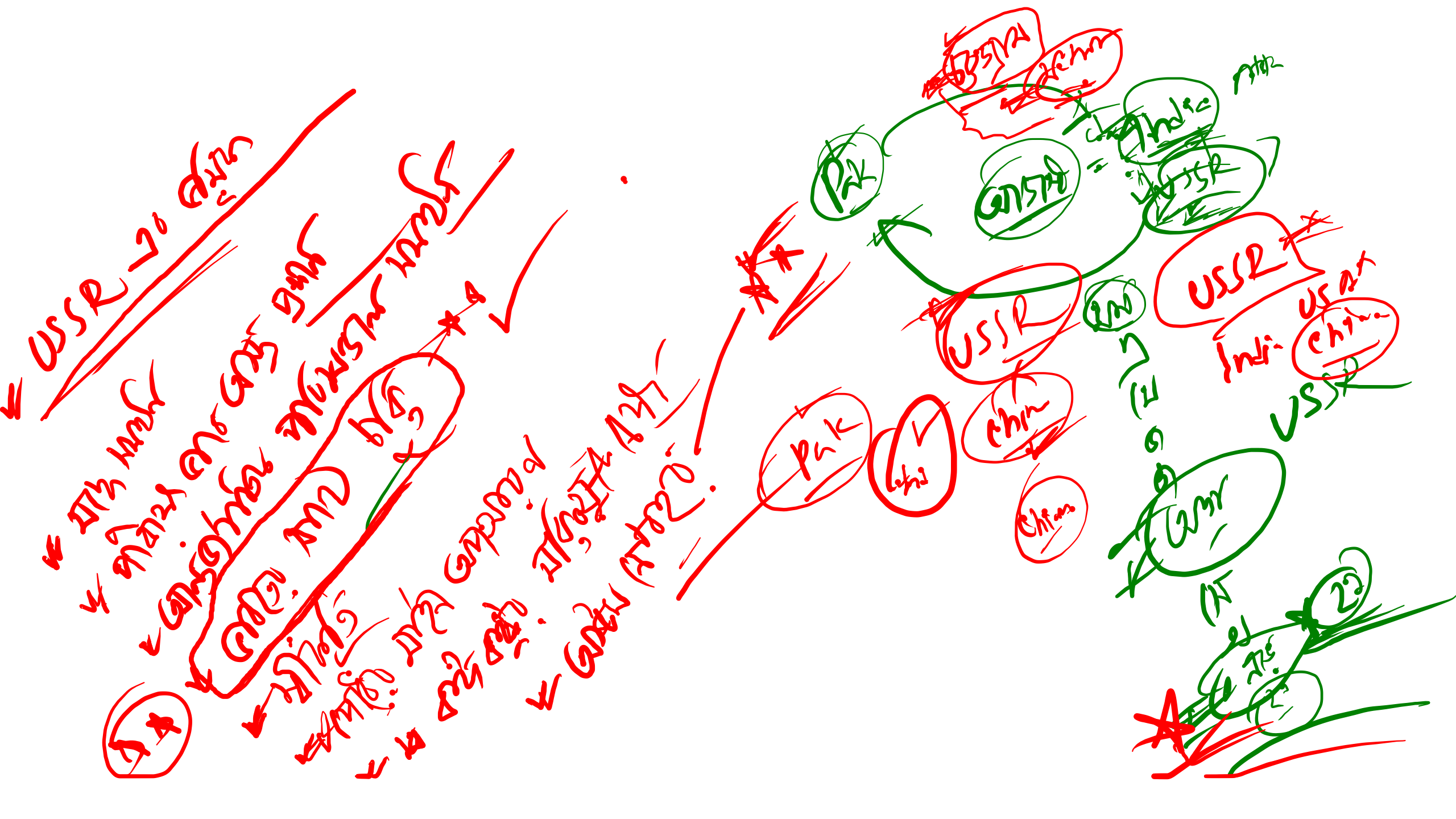

USSR
Pak
India
USSR
USSR
Chin
China
USSR
India
China
US
USSR

মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন না করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতমূলক হওয়ার পিছনে নিম্নলিখিত কারণগুলোকে চিহ্নিত করা যায়:

পাকিস্তানের সাথে বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক

পাকিস্তানের সাথে ছিল আমেরিকার বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কারণ এশিয়া তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে আমেরিকার বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল পাকিস্তান। এমনকি আমেরিকা যখন এশীয় রাজনীতিতে আরও বেশি প্রাধান্য স্থাপনের জন্য নতুন মিত্র খুঁজছে ঠিক সেসময়ে পাকিস্তানের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল চীন-মার্কিন সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের সূচনা। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় এবং হেনরি কিসিঞ্জারের কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডে আমেরিকার সঙ্গে চীনের বরফ শীতল সম্পর্কের অবসান ঘটে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যস্থতার সুযোগ পেয়ে পাকিস্তান দুই বৃহৎ শক্তির বিশিষ্ট বন্ধুতে পরিনত হয়। সুতরাং পাকিস্তানের সঙ্গে এ বিশেষ সম্পর্কের কারণে চীন ও আমেরিকার কেউই পাকিস্তান বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেনি।

আমেরিকার সোভিয়েত-ভারত বিরোধী নীতি

বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল পরস্পর বিরোধী শিবিরের নেতৃত্বে। বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করা নিয়ে উভয়ের মধ্য স্নায়ুযুদ্ধ বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া দক্ষিণ এশীয় রাজনীতিতে ভারত ছিল আমেরিকার স্বার্থ পরিপন্থি। তাই দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রমপ্রসারমান রুশ প্রভাব মোকাবিলা করার জন্য পাকিস্তানকে শক্তিশালী করা আমেরিকার স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল। সুতরাং উপযুক্ত নানা বিষয়ে ভেবে চিন্তেই আমেরিকার সরকারি মহল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

USA বা দেখুন

কাজ: দাও বুঝে ২য় ওয়ার্ল্ড

কাজেরা দাম: মহিলারা: ভোটাধিকার

দাসপ্রথা: শ্রমিকসংঘ কেটি

৭ম সংঘ: প্রেম

চন্দ্র কেন: উত্তর

আর্থিক না দেওয়া

Bk

না

মুক্তিযুদ্ধে চীনের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের যেসব শক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল চীন তাদের অন্যতম। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে চীনের সরকারি অবস্থান ছিল পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতমূলক। বাংলাদেশের সংকট নিয়ে চীনের প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয় ১১ এপ্রিল ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি চৌ এন লাই-এর চিঠির মাধ্যমে। ঐ চিঠিতে চৌ এন লাই পাকিস্তানের ঘটনাবলিকে সে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে জানান এবং জনগণ বিদেশি হস্তক্ষেপ ছাড়াই তা সমাধান করবে বলে উল্লেখ করেন। এমনকি পাকিস্তানের জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায় চীনের দ্ব্যর্থহীন সমর্থনের কথাও তিনি জানিয়েছিলেন। অবশ্য চিঠিতে তিনি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কোনো বক্তব্য রাখেননি। তবে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে চীন বাঙালির সংগ্রাম ও নির্যাতনের প্রতিও কোন সহানুভূতি দেখায়নি। বরং পাক সামরিক চক্রের প্রতি জানিয়েছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। এমনকি চীনপন্থি রাজনীতিবিদ হিসাবে পরিচিত মাওলানা ভাসানীর আকুল আবেদন সত্ত্বেও চীনা নীতিতে কোন পরিবর্তন আসেনি।

মুক্তিযুদ্ধে চীনের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীনের বিরোধিতার কারণ

চীনের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ও পাকিস্তানপন্থি নীতি গ্রহণের কারণগুলোকে নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যায়:

- ✓ চীন নিজেই একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র। চীনা, মঙ্গোল, তিব্বতি, তুর্কি ইত্যাদি জনগোষ্ঠী নিয়ে গড়ে উঠেছে চীনের রাষ্ট্রীয় সত্তা। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রশ্নে চীনা জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে তখনই অনেক সমস্যা বিদ্যমান। তাই একাধিক জাতি অধ্যুষিত পার্শ্ববর্তী কোন দেশে সংগ্রামরত কোনো জনগোষ্ঠীকে সমর্থন করলে ভবিষ্যতে তা তার অভ্যন্তরীণ সংহতির প্রতি হুমকি হবার সম্ভাবনা ছিল।
- ✓ চীন নিজেই তাইওয়ানকে মূল ভূ-খণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করতে সচেষ্ট ছিল। তাই পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান হতে স্বাধীন হওয়ার সংগ্রামে সমর্থন দিলে তা হতো চীনের দ্বিমুখী নীতিরই পরিচায়ক।
- ✓ চীনের বিবেচনায় মুক্তিযুদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম ছিল না এবং সত্যিকার অর্থে এটা কৃষক-শ্রমিক জনতার সমর্থনপুষ্ট একটি গণযুদ্ধ ছিল না। বরং ভারত-পাকিস্তান সমর্থনপুষ্ট হয়ে কিছু বিভ্রান্ত বুর্জোয়া বাঙালি নেতা পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্টের সংগ্রামে লিপ্ত বলে চীন মনে করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধে চীনের ভূমিকা

- ✓ ভারতে আওয়ামী নেতৃবৃন্দের প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড থেকে চীন যথার্থই অনুধাবন করেছিল যে, বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলে তা হবে ভারতের প্রভাবাধীন একটি রাষ্ট্র এবং চূড়ান্ত বিচারে চীনের দক্ষিণ সীমান্ত এলাকায় এ রাষ্ট্রটি রুশ-ভারত আঁতাতের একটি তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হবে- যা হবে চীনের জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ।
- ✓ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও চীন-সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্ক ছিল শত্রুতার। তাই দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব সম্প্রসারণ মোকাবেলায় পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের সহযোগিতা করার প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের পর চীন শঙ্কিত হয়ে পড়ে যে, পাকিস্তানের পূর্ব প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তান দুর্বল হয়ে পড়লে ভারতের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।
- ✓ পাকিস্তান ছিল চীনের ঘনিষ্ঠ মিত্র। তাই সংকটকালে চীন যদি পাকিস্তানকে সমর্থন না করে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে, তবে অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্রের মধ্যে চীনের বন্ধুত্ব নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হবে। সুতরাং নিজস্ব সুবিধা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সব কিছু বিবেচনা করেই চীন মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছিল। তবে চীনের দক্ষিণ সীমান্তের নিরাপত্তার স্বার্থে চীন কর্তৃক শক্তিশালী পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার নীতি গ্রহণযোগ্য হলেও আদর্শিক দিক দিয়ে বিচার করলে চীনের নীতি ছিল বিভ্রান্তকর। কারণ আওয়ামী লীগ একটি বুর্জোয়া দল হলেও মুক্তিযুদ্ধ কোন দলের ছিল না বরং কৃষক-শ্রমিক-জনতার অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ একটি গণযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। আপামর জনতা ছিল এ যুদ্ধের প্রধান শক্তি।

China จีน:

✓ ตะวันตก ตลาด, หมดไป

✓ สังคมนิยม USSR 2.0 หมดไป

✓ โลกสวย - โลกจริง/ปรับใหม่: ไว้ใจ

✓ เมือง ~~ชุมชน~~ ต่างชาติ: ยุ่ง

✓ ตลาดกลาง: สาย ชีวิต

✓

মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা

মানবিক কার্যক্রম সংক্রান্ত তৎপরতা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্ব হতেই শরণার্থী সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে এবং দ্রুত এটি দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংকট হতে একটি আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এত বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী আর কখনো বাস্তুচ্যুত হয়নি। জাতিগত নিপীড়ন, হিন্দু বিদ্বেষ ও গণহত্যার কারণে বিশেষ করে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ মধ্যরাতে যে বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরু হয় তারপর হতে প্রাণভয়ে ও নিরাপত্তার সন্ধানে লক্ষ লক্ষ মানুষ পার্শ্ববর্তী ভারতের সীমান্তবর্তী গ্রাম ও শহরগুলোতে আশ্রয় নেয়। ডিসেম্বর নাগাদ শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১ কোটি। এই বিপুল পরিমাণ শরণার্থীর খাদ্য, পানীয়, ঔষধপত্র, মাথাগোঁজার ঠাঁই ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে। আর এই জটিল অবস্থা মোকাবেলায় অর্থাৎ শরণার্থী সমস্যা ও মানবিক বিষয়ে জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৭১ সালে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার (UNHCR) প্রধান প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান শরণার্থী সমস্যাকে জাতিসংঘের জন্য এক মানবিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে অভিহিত করেন। মানবিক সমস্যা মোকাবেলায় উপমহাদেশে জাতিসংঘের দুটো মিশন কাজ করে। এর একটি পরিচালিত হয় ভারতে, অপরটি দখলীকৃত বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তানে)। শরণার্থী সমস্যায় মানবিক সাহায্য প্রদানে সহায়তার জন্য জাতিসংঘ সরাসরি প্রস্তাব প্রদান করে ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল। কিন্তু জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আগাশাহী সরাসরি এর বিরোধিতা করেন। তবে পাকিস্তানের বিরোধিতা সত্ত্বেও জাতিসংঘ মহাসচিব উ-থান্ট ২২ এপ্রিল দ্বিতীয়বারের মতো মানবিক সাহায্য প্রদানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে পত্র দেন।

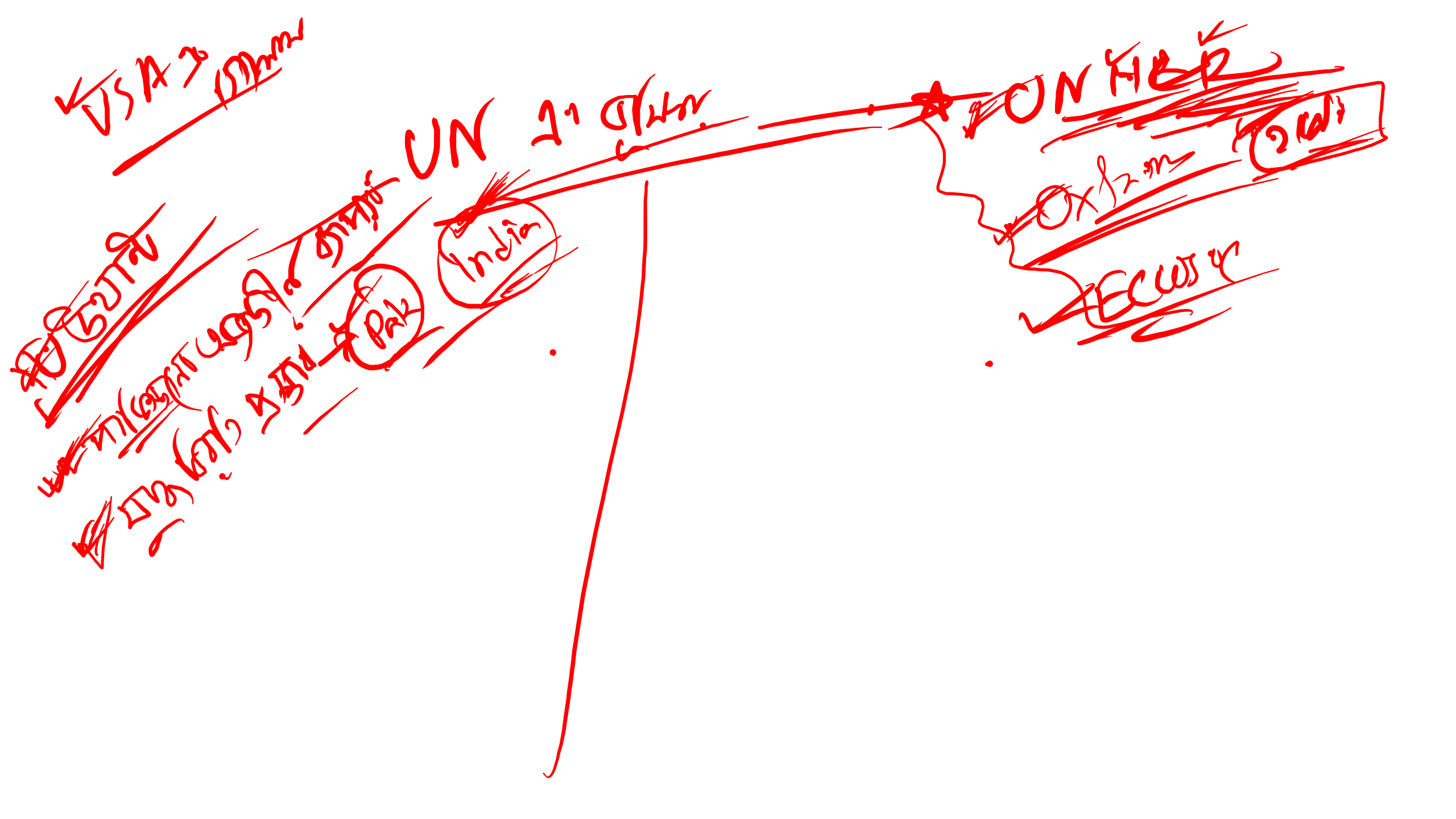

USA
UN
India
Pak
UNHCR
Oxfam

মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের তৎপরতা

জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ'-এর সদর দফতর জেনেভায় পরিষদের ৫১তম অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে জাতিসংঘ মহাসচিব ভারত ও পাকিস্তানে ত্রাণ তৎপরতায় অংশ নিতে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থাকে আহ্বান জানান। পরিষদের ১১ দিনব্যাপী বিতর্ক ও আলোচনার পর ১৬ জুলাই উপমহাদেশে জাতিসংঘের ত্রাণ কার্যক্রমকে অনুমোদন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে জাতিসংঘের সাহায্য প্রস্তাবকে পাকিস্তান প্রথম দিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এ ধরনের উদ্যোগকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু ১৯৭০-এর প্রলয়ংকারী জলোচ্ছ্বাস, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্যদের অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ, ক্ষেতের ফসল রেখে মানুষের ভারতে পালিয়ে যাওয়া, ভয়হীন চিত্তে ফসল উৎপাদন করতে না পারা ইত্যাদি কারণে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনির মুখে ইয়াহিয়ার নীতিতে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক সাহায্য ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। এ অবস্থায় জাতিসংঘ মহাসচিব পাকিস্তানের অনুরোধে ১৬ জুন দ্বিতীয়বার বিশ্ববাসীর নিকট আবেদন জানিয়ে বলেন- পাকিস্তান সরকার ও জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ মনে করে যে, পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য সামগ্রীর জরুরি প্রয়োজন এবং ত্রাণকার্য পরিচালনার করা দরকার। ফলে জাতিসংঘের উদ্যোগে পূর্ব পকিস্তানে পরিচালিত হয় UNEPRO (United Nations East Pakistan Relief Operation) কার্যক্রম।

মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা

যুদ্ধ বন্ধ ও রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগে মহাসচিবের "গুড অফিস"

১৯৭১ এর জুলাই মাসে জাতিসংঘ মহাসচিব ৯৯ ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি ও সদস্য রাষ্ট্রসমূহের বরাবরে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেন। মহাসচিবের এই স্মারকপত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি মূল ইস্যুগুলো এড়িয়ে গেছেন এবং তাঁর এ উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানকে কিছুটা সহায়তা করা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন একটি চূড়ান্ত পরিণতির দিকে যাচ্ছিল ঠিক সে সময় জাতিসংঘ মহাসচিব সংকট নিরসনে আরেকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২০ অক্টোবর ভারত ও পাকিস্তান সরকারের কাছে এক পত্রে তিনি তাঁর Good Office ব্যবহারের প্রস্তাব দেন। মহাসচিবের এই পত্রটির অন্তর্নিহিত অর্থ হলো সমগ্র বিষয়টিকে তিনি ভারত পাকিস্তান সংঘাত হিসেবে বিবেচনা করেন। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম অমীমাংসিত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই মহাসচিবের প্রস্তাবের একদিন পরই পাকিস্তান প্রস্তাবটিতে সম্মতি জানায়। কিন্তু ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এক বার্তায় মহাসচিবের বিরুদ্ধে মূল সমস্যা পাশ কাটিয়ে কৌশলে পাকিস্তান সামরিক জান্তাকে রক্ষা করতে চাওয়ায় অভিযোগ তুলেন। তিনি আরও বলেন, ভারত-পাকিস্তানের পরিবর্তে তাঁর উচিত ইয়াহিয়া খান ও আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান করা।

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সমর্থন ও সহযোগিতার কারণ

রাজনৈতিক ও সামরিক কারণ

রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে বলে থাকেন যে, ভারত তার জন্মশত্রু পাকিস্তানকে দুপাশে রেখে শুরু থেকেই খুব অস্বস্তিতে ছিল। প্রথম থেকেই পাকিস্তান ভারতের জন্য যেমন ছিল সামরিক হুমকি, তেমনি ছিল ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিরও বিরোধী। পাকিস্তানের বিবেচনায় ভারত একটি হিন্দু রাষ্ট্র এবং হিন্দুরা হচ্ছে মুসলিম বিরোধী। পাকিস্তানের এ বিবেচনা ভারতের জন্য স্বস্তিদায়ক ছিল না। তাছাড়া দু'সীমান্তে প্রতিরক্ষার জন্য ভারতকে বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছিল। সুতরাং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সুযোগে পাকিস্তানকে ভাঙ্গার সুযোগ পেয়ে ভারত সঙ্গে সঙ্গে তা লুফে নিয়ে পাকিস্তানকে বিভক্ত করতে তৎপর হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

নকশাল আন্দোলন দমন

ভারতে এক শ্রেণির বামপন্থি বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ মনে করেন যে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ক্রমবর্ধমান নকশাল আন্দোলন ও নাগা বিদ্রোহকে দমন করার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। কারণ মুক্তিকামী বাঙালির আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হলে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের পূর্বাঞ্চল ভারতের জন্য সমস্যা হতে পারতো।

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা

শরণার্থী সমস্যা

ব্যাপক নিধন ও নির্যাতনের কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ ব্যাপক হারে বাঙালির দেশত্যাগ ও শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ভারতের জন্য ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রায় এক কোটির মতো শরণার্থীর ভার বহন করতে ভারতের বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় হতে থাকে। শুধু তাই নয়, শরণার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যের ওপর অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। শরণার্থীর সংখ্যা যত বাড়তে থাকে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠতা প্রদর্শনের দাবি ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের ওপর ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মানবিক কারণ

সাংবিধানিকভাবে ভারত হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। পক্ষান্তরে পাকিস্তান হচ্ছে একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র- যা অধিকাংশ সময় শাসিত হয়েছে সামরিক শাসক দ্বারা। আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দর্শন ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা- যা ছিল ভারতের জন্য স্বস্তিদায়ক। তাই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পর ভারত চেয়েছিল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসুক। তাহলে পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরে আসবে, সামরিক উত্তেজনা কমবে এবং পাকিস্তানের ধর্মীয় রাষ্ট্রের চরিত্র লোপ পাবে। কিন্তু পাক সামরিক শাসকবর্গ নির্বাচনে বিজয়ীদের ক্ষমতা প্রদান না করে ব্যাপকভাবে হত্যা, ধর্ষণ এবং নিপীড়ন ও নির্যাতন শুরু করলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ভারত নির্বাচনে বিজয়ী বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করে এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী জনতাকে সামগ্রিক সহযোগিতা করতে তৎপর হয়।

মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন ও সহযোগিতায় ভারতের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

প্রশিক্ষণদান

সেক্টর কমান্ডারদের অধীনে নিয়মিত বাহিনীকে ট্রেনিং করানো, তরুণ সম্প্রদায়কে রিক্রুট করা ও প্রশিক্ষণ দান, বিভিন্ন গেরিলা সংগঠনকে প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদির মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৭১ সালের ৩০ এপ্রিল এ ব্যাপারে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব প্রদান করে এবং ৯ মে তাদের হাতে ন্যস্ত হয় মুক্তিযুদ্ধে যোগদানেচ্ছুকদের ট্রেনিংয়ের দায়িত্ব। ইতঃপূর্বে (এপ্রিল) বিএসএফ বিক্ষিপ্তভাবে প্রশিক্ষণ, অস্ত্র সরবরাহ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে যে সাহায্য করছিল সেনাবাহিনী দায়িত্ব গ্রহণের পর মে মাসে তার উন্নতি ঘটে। তবে তরুণদের ট্রেনিং-এর ব্যাপারে ভারতীয় প্রশাসন ছিল দ্বিধাবিভক্ত। নকশালবাদী, নাগা, মিজো প্রভৃতি সশস্ত্র বিদ্রোহীদের তৎপরতা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা সম্বন্ধে ভারতীয় প্রশাসনকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দকৃত অস্ত্রসমূহ সন্ত্রাসবাদী বা বিদ্রোহীদের হাতে যে পৌঁছাবে না- এ নিশ্চয়তার অভাবই তাদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল। তাই 'যুব শিবির' ও 'অভ্যর্থনা শিবির'-এর মাধ্যমে তরুণদের রিক্রুট এবং আওয়ামী পরিষদ দ্বারা শনাক্তের পর তাদেরকে ট্রেনিং ক্যাম্পে ভর্তি করা হতো যেন বামপন্থিরা ট্রেনিংয়ের সুযোগ না পায়। এজন্য প্রথম দিকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানে আগ্রহীদের তুলনায় ট্রেনিং-এর সুযোগ ছিল সীমিত।

USSR

মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন ও সহযোগিতায় ভারতের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

মুজিব বাহিনী গঠন

ভারত যে পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছিল তার প্রমাণ মুজিব বাহিনী গঠন। মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে নেতৃত্ব যেন কমিউনিস্ট বা চরমপন্থিদের হাতে চলে না যায় সেজন্য বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শে সজ্জিত একদল তরুণ ও যুবকদের নিয়ে মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। এ বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ডার ছিলেন তোফায়েল আহমদ, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও শেখ ফজলুল হক মনি। শেখ ফজলুল হক মনি মুজিব বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অনেকের মতে, মুক্তিযুদ্ধের মাঝপথে খন্দকার মোশতাকসহ আপসকামী কোনো আওয়ামী লীগ নেতা বা অস্থায়ী সরকারের কেউ যাতে পাকিস্তানের সাথে আপোস করতে না পারে, সেজন্য মুজিব বাহিনী গঠন জরুরি হয়ে পড়েছিল। তবে মুজিব বাহিনী গঠন নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে।

মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন ও সহযোগিতায় ভারতের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

অস্ত্র প্রদান

মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরবরাহ করেছিল। শক্তিশালী পাকিস্তানি আর্মির মোকাবেলা করতে প্রয়োজনীয় অস্ত্র আমদানি এবং তা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সরবরাহ করে ভারত মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। লক্ষাধিক মুক্তিযোদ্ধার প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও অন্যান্য রসদ সরবরাহের জন্য সামরিক খাতে ভারতকে শরণার্থীদের পিছনে ব্যয়ের প্রায় দ্বিগুণ ব্যয় করতে হয়েছিল বলে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছিল।

শরণার্থীদের আশ্রয় দান

শরণার্থীদের আশ্রয় দান মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের সহযোগিতার আর এক অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিদিন ২০ হাজার হতে ৪৫ হাজার অসহায় নিরস্ত্র বাঙালি ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল (২৬ মার্চ হতে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ)। বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান মিলিয়ে প্রায় এক কোটির মতো লোক ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল। এ বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর পিছনে ভারত সরকারের বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন ও সহযোগিতায় ভারতের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

বেতার কেন্দ্রের জন্য ট্রান্সমিটার প্রদান

মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী প্রবাসী সরকারের (মুজিবনগর সরকারের) প্রচার প্রচারণার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি বেতার কেন্দ্র। তাই ভারত সরকার ৫০ কিলোওয়াটের একটি ট্রান্সমিটার যন্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটি বাড়িতে ছিল এর রেকর্ডিং স্টুডিও এবং ৩৯, সুন্দরী মোহনস্ট্রিটের ৮ তলা বাড়ির ছাদ হতে অনুষ্ঠান প্রক্ষেপণ করা হতো।

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর

১৯৭১ সালের জুলাই মাসে হেনরি কিসিঞ্জারের প্রচেষ্টায় এবং পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় আমেরিকার সাথে চীনের বরফ শীতল সম্পর্কের অবসান ঘটে। এর ফলে চীন ও আমেরিকার কাছে পাকিস্তান প্রিয় হয়ে ওঠে- যা ভারতের জন্য ছিল উদ্বেগজনক। এ অবস্থায় ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ২০ বছরের মৈত্রী চুক্তি করে- যার মূল বিষয় ছিল দু'দেশের কেউ আক্রান্ত হলে একে অপরকে সাহায্য করবে। এর ফলে মুক্তিকামী জনতার মনোবল বহুগুণে বেড়ে যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সামরিক সাহায্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং ভারত আরও দৃঢ়ভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়।

মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন ও সহযোগিতায় ভারতের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রচারণা

প্রথমদিকে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের কোন মিশন ছিল না। পরবর্তী সময়ে কিছু মিশন স্থাপিত হলেও তা ছিল খুবই সীমিত। তাই যেসব স্থানে ভারতের মিশন ছিল সেসব স্থানে ভারত বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা এবং নিরীহ বাঙালির বিরুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অন্যায় আক্রমণ ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষে তৎপরতা চালিয়েছিল। শুধু তাই নয়, মুসলিম বিশ্ব এবং পশ্চিমা শক্তিবর্গকে পাকিস্তানের পর্যায়ক্রমিক অপপ্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে ভারতের সরকার ও বিরোধী দলের নেতারা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রথমে দিল্লিতে অবস্থানরত রাষ্ট্রদূতদের বোঝানো, তারপর বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানের কাছে মন্ত্রী পর্যায়ের দূত পাঠানো এবং পরবর্তী পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র সহ ৮টি দেশ সফর করার মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধী যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য দেশগুলোকে তাঁর অবস্থান আংশিকভাবে হলেও বোঝাতে পেরেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন ও সহযোগিতায় ভারতের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান

ভারত কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সমর্থন ও সহযোগিতার এক উজ্জ্বল অধ্যায় হচ্ছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে। এর ফলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ স্বীকৃতি লাভ করে এবং মুক্তিকামী জনতার মনোবল বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

মিত্র বাহিনী গঠন ও সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সবধরনের সমর্থন ও সহযোগিতা করলেও ভারত ডিসেম্বরের ৩ তারিখ পর্যন্ত সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তবে ২১ নভেম্বর ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে যৌথকমান্ডো গঠিত হয়েছিল। কিন্তু যে কোন সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে- এমন একটি চিন্তা ও প্রস্তুতি ভারত সরকারের মধ্যে জাগ্রত ছিল। মুক্তিবাহিনীর পর্যায়ক্রমে আক্রমণে যশোরের চৌগাছা সহ একের পর এক এলাকা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতছাড়া হতে থাকলে পাকিস্তান হঠাৎ করে ভারতের পশ্চিম অঞ্চলের কয়েকটি শহর আক্রমণ করে ৩ ডিসেম্বর। ফলে শুরু হয় পাক-ভারত যুদ্ধ। কিন্তু ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখ হতে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনী একসাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়।

বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি

দেশের নাম	স্বীকৃতির তারিখ	দেশের নাম	স্বীকৃতির তারিখ
ভুটান	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	ফ্রান্স	১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
ভারত	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	ব্রিটেন	৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
পূর্ব জার্মানি	১১ জানুয়ারি, ১৯৭২	যুক্তরাষ্ট্র	৪ এপ্রিল, ১৯৭২
পোল্যান্ড	১২ জানুয়ারি, ১৯৭২	ভেনিজুয়েলা	২ মে, ১৯৭২
বুলগেরিয়া	১২ জানুয়ারি, ১৯৭২	কলম্বিয়া	২ মে, ১৯৭২
মায়ানমার	১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২	ইরাক	৮ জুলাই, ১৯৭২
নেপাল	১৬ জানুয়ারি, ১৯৭২	পাকিস্তান	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪
সোভিয়েত ইউনিয়ন	২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২	সৌদি আরব	১৬ আগস্ট, ১৯৭৫
ফিজি	১৬ জানুয়ারি, ১৯৭২	চীন	৩১ আগস্ট, ১৯৭৫
সেনেগাল	১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২		

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত 'মুজিবনগর সরকার'-এর পরিচয় দিন। [৪৪তম বিসিএস]
- মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের অবদান বিশ্লেষণ করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারকে কি প্রবাসী সরকার বলা যায়? [৪৪তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও ভারতের ভূমিকা কী ছিল তা আলোচনা করুন। [৩৮তম বিসিএস]
- খেতাবপ্রাপ্ত তিনজন নারী মুক্তিযোদ্ধার নাম, অবদানসহ উনারা কোন কোন সেক্টরে যুদ্ধ করেন? বর্ণনা করুন। [৩৬তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নসমূহ:

- কোথায় এবং কেন মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে? [৩৮তম বিসিএস]
- আত্মসমর্পণ দলিলের তাৎপর্য কি? [৩৮তম, ৩৬তম বিসিএস]
- বীরশ্রেষ্ঠগণের নাম লিখুন [৩৮তম বিসিএস]
- স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য কি? [৩৮তম বিসিএস]
- মুজিবনগর সরকার বলতে কি বুঝেন? [৩৬তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

টীকা সমূহ:

- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর [৪৪তম বিসিএস]
- বাংলা একাডেমি [৪৪তম বিসিএস]
- শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস [৩৮তম, ১১তম বিসিএস]
- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ [৩৮তম বিসিএস]
- মুজিবনগর সরকার [৩৭তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ [৩১তম বিসিএস]
- বীরশ্রেষ্ঠ [১৫তম বিসিএস]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Intermission

৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ০৫

টপিক:

মুক্তিযুদ্ধ-২: বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি, সংবিধান প্রণয়ন, ১৯৭৩ সালের নির্বাচন, বঙ্গবন্ধুর শাসনামল ও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের **স্বাধীনতা ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।**
- **২৯০ দিন** পাকিস্তানের কারাগার থেকে ছাড়া পান **১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি**। এদিন তাঁকে ও ড. কামাল হোসেনকে বিমানে তুলে দেওয়া হয়। সকাল সাড়ে ৬টায় তাঁরা পৌঁছান **লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে**।
- সকাল ১০টার পর থেকে তিনি ব্রিটেনের **প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ**, তাজউদ্দীন আহমদ ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ অনেকের সঙ্গে কথা বলেন।
- পরে ব্রিটেনের বিমানবাহিনীর একটি বিমানে তিনি পরের দিন **৯ জানুয়ারি দেশের পথে যাত্রা** করেন।
- লন্ডন থেকে ঢাকা আসার পথে বঙ্গবন্ধু **১০ তারিখ** সকালেই নামেন দিল্লিতে। তিনি সেখানে ভারতের **রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী,** সমগ্র মন্ত্রিসভা, নেতৃবৃন্দ, তিন বাহিনীর প্রধানগণ এবং অন্যান্য অতিথি ও সে দেশের জনগণের কাছ থেকে উষ্ণ সংবর্ধনা লাভ করেন।
- **১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারি দুপুর ১ টা ৪১ মিনিটে** শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমল

পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি মুক্ত হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১০ জানুয়ারি লন্ডন হয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি হিসেবে এক আদেশ জারী করেন বঙ্গবন্ধু। এই আদেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকারের চ্যালেঞ্জসমূহ

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন

দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হলে বাংলাদেশ একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে পরিণত হয়। এই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে পুনর্গঠন সমস্যা সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। কেননা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহারের অনুপযোগী করে দেয়। স্কুল, কলেজ, কলকারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেয়। দায়িত্বভার গ্রহণের পর বঙ্গবন্ধু সরকারকে এসব সমস্যার সমাধানের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমল

অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবিলা

পাকিস্তানি শাসক চক্রের অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তান ছিল বঞ্চিত। তার পরে ৯ মাস সশস্ত্র সংগ্রামের ফলে দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও খাদ্য মজুদ বলতে কিছুই ছিল না। লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যাওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এর উপরে দেশে দেখা দেয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সরকারকে অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়তে হয়।

শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলা

মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের দেশে ফিরিয়ে আনা ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন এবং মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে যেসব ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য বাংলাদেশের পক্ষে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এছাড়াও, ভারতে যারা শরণার্থী হয়েছিলেন তাদেরকেও দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমল

আইন-শৃঙ্খলা সমস্যা মোকাবিলা

মুক্তিযুদ্ধের সময় সাধারণ জনতা অস্ত্র হাতে নিয়েছিল পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতার পর অনেকে অস্ত্র জমা দিলেও এর পরেও বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সাধারণের হাতে রয়ে যায়। ফলে সশস্ত্র ডাকাতি, লুটতরাজ ও ছিনতাই ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। এই অবস্থা মোকাবিলায় বঙ্গবন্ধু সরকারকে হিমশিম খেতে হয়।

সন্ত্রাসী তৎপরতা মোকাবিলা

স্বাধীনতার পরে বিভিন্নমুখী সন্ত্রাসী তৎপরতা দেখা দেয়। চীনপন্থী তথাকথিত বাম সংগঠন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে মেনে নেয়নি। তারা মুক্তিযুদ্ধকে অসমাপ্ত বিপ্লব হিসেবে মনে করতো। তারা আরও মনে করতো মুজিব সরকার হচ্ছে রুশ - ভারত কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া 'অবৈধ' সরকার। তাই তারা মুজিব সরকারকে উৎখাতের জন্য 'গুপ্ত বাহিনী' গড়ে তোলে। ১৯৭৩ সালে তারা অসংখ্য থানা আক্রমণ করে, অস্ত্র লুট করে।

এছাড়া স্বাধীনতা উত্তর সরকারকে/মুজিব সরকারকে নিম্নোক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করতে হয়:

- ✓ বীরাঙ্গনা ও নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন
- ✓ প্রশাসন পুনঃবিন্যাস
- ✓ সেনাবাহিনী গঠন, মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন,
- ✓ শিক্ষানীতি, কৃষিনীতি, জ্বালানি নীতি ইত্যাদি প্রণয়ন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমল

মুজিব সরকারের সফলতা

সংবিধান প্রণয়ন

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে সংবিধান প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ২৩ মার্চ, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারি করেন। তিনি ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন। ১১ এপ্রিল ড. কামাল হোসেনকে প্রধান করে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করেন। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর (১৮ কার্তিক, ১৩৭৯) খসড়া সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর করা হয়। এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে একটি স্বাধীন দেশের প্রথম সংবিধান রচনা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ। দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ১০ মাসের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি সংবিধান প্রণয়ন মুজিব সরকারের বিশেষ কৃতিত্ব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির দীর্ঘ ৯ বছর পর অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে প্রথম সংবিধান প্রণয়ন করতে সমর্থ হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমল

শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

মুক্তিযুদ্ধকালে পাকবাহিনীর অত্যাচার, গণহত্যার শিকার হয়ে প্রায় এক কোটি বাঙালি ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭১ সালের ২৯ ডিসেম্বর শরণার্থীদের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন কর্মসূচি শুরু হয়। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে ৯৮,৬৯,৪৫৬ জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসে।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অবসান

আওয়ামী লীগ ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক সংগঠন। ব্যক্তিগতভাবে শেখ মুজিব ছিলেন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ঘোর বিরোধী। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে মূল্যায়ন করা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করাকে তিনি বরাবরই ঘৃণা করতেন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অবসান ঘটানোর জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি সংযোজন করেন যা বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই সমাদৃত হয়।

কৃষি ও কৃষকের কল্যাণ চিন্তা

১৯৭১ সালে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সময় এদেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক গৃহহীন, সম্পদহীন হয়ে পড়ে। এসব রিক্ত নিঃস্ব কৃষককে বাঁচাবার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত তাঁর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই কিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু জানতেন যে, জমি এদেশের কৃষকের নিকট তাদের সন্তানের মতো প্রিয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমল

তিনি এটাও জানতেন যে, কৃষক বাঁচলে দেশ বাচঁবে এজন্য তিনি বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

- ✓ ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সকল প্রকার কৃষি জমির খাজনা ও তার সুদ মওকুফ করা হয়।
- ✓ ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন।
- ✓ পরিবার প্রতি সর্বাধিক ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা সিলিং নির্ধারণ করা হয়।
- ✓ পাকিস্তান শাসনামলে রুজু করা ১০ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদেরকে তাদের সকল বকেয়া ঋণ সুদসহ মাফ করে দেয়া হয়।
- ✓ খাদ্য মজুদ গড়ে তোলার জন্য সারাদেশে খাদ্যগুদাম নির্মাণের কাজ শুরু করেন।
- ✓ কৃষিপণ্যের ন্যূনতম বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়।
- ✓ ১৯৭৩ সালের মধ্যে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প (GK Project) চালুর ব্যবস্থা করা হয়।
- ✓ সারাদেশে হ্রাসকৃত মূল্যে ৪০ হাজার লো-লিফট পাম্প, ২৯০০ গভীর নলকূপ ও ৩০০০ অগভীর নলকূপ, ধান, পাট ও গমবীজ এবং ইউরিয়া, পটাশ ও টি.এস.পি সার ১৯৭২ সালের মধ্যেই কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়।
- ✓ কৃষিবিষয়ক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমল

মুক্তিযুদ্ধাদের অস্ত্র জমাদান

১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র জমা দিতে বলেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭২ সালের ২৫ জানুয়ারি টাঙ্গাইলে কাদের সিদ্দিকী এবং তাঁর "কাদেরিয়া বাহীনির" ১৫ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্র জমা দেন। ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি মুজিব বাহিনী প্রধান শেখ ফজলুল হক মনি, তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক ও সিরাজুল আলম খান বঙ্গবন্ধুর নিকট মুজিব বাহিনীর অস্ত্র জমা দেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

১৯৭১ সালে যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ হারান এবং যুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসীকতা প্রদর্শন করেন বঙ্গবন্ধু তাঁদের মধ্যে ৭ জন শহিদ মুক্তিযোদ্ধাকে বীরশ্রেষ্ঠ, ৬৮ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বীর উত্তম, ১৭৫ জনকে বীর বিক্রম এবং ৪২৬ জনকে বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করেন।

জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় কুচকাওয়াজ সঙ্গীত নির্বাচন

১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, জাতীয় পতাকায় বাংলাদেশের মানচিত্র থাকবে না, থাকবে লালসূর্য। মন্ত্রিসভার এ বৈঠকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' এর প্রথম দশ চরণ বাংলাদেশের 'জাতীয় সঙ্গীত' হিসেবে গৃহীত হয়। জাতীয় কুচকাওয়াজ সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'চল চল চল' সঙ্গীত গৃহীত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমল

গণমুখী শিক্ষা ও শিক্ষা কমিশন গঠন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা গড়া। এজন্য প্রয়োজন ছিল সোনার মানুষ। প্রয়োজন ছিল দেশের শিক্ষাদানযোগ্য প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে অন্তত পক্ষে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করা এবং সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা। মুজিব সরকার অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানভিত্তিক করার জন্য ১৯৭২ সালে ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুন বাতিল করে গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ ৭৩ প্রণয়ন করে। এছাড়াও মুজিব সরকার ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে কয়েক লক্ষ শিক্ষক নিয়োগ ও ১১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বহু স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নির্দেশনাও দেওয়া হয় এ সময়।

পুনর্বাসন

বঙ্গবন্ধু সরকারের অন্যতম সফলতা হচ্ছে ভারতে আশ্রয় নেয়া ১ কোটি লোককে পুনর্বাসন করা। মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য যারা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় নিয়ে ছিল তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসন করেছিলেন। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে যারা শহিদ হয়েছিলেন তাদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যদান, নির্যাতিত মা-বোনদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। মুজিব সরকার তার সফল কূটনীতি দ্বারা পাকিস্তানে আটকে পড়া ১ লক্ষ ২২ হাজার বাঙ্গালিকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমল

জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান

১৯৭০ সালে পাকিস্তানে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তা ছিল যুক্ত পাকিস্তানি কাঠামোতে। তাই স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত সরকার বৈধ নয় এরূপ গুঞ্জন ওঠার সাথে সাথে সরকার গঠনের মাত্র ১৫ মাসের মাথায় ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু সরকার স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩টি আসনে জয়লাভ করেন।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড গঠন

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সারাদেশে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ৫০০০ কি. মি. বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BPDB)' গঠন করেন।

বাংলাদেশ বার কাউন্সিল গঠন

আইনজীবীদের তালিকাভুক্ত এবং এজন্য পরীক্ষা গ্রহণ, অসদাচরণের জন্য নিবন্ধন বাতিল প্রভৃতি কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে 'বাংলাদেশ বার কাউন্সিল' নামে আইনজীবীদের সর্বোচ্চ সংগঠন। আইনজীবীদের সর্বোচ্চ সংগঠন গঠিত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরে উদ্যোগে। তিনি ১৯৭২ সালে 'রাষ্ট্রপতির ৪৬ নং আদেশবলে' বাংলাদেশ বার কাউন্সিল গঠন করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমল

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সাফল্য

বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক দেশটির নির্মাতা ও বাঙালি জাতীয়বাদের স্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়েছেন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির স্থপতি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেয়েছিলেন বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে। এ জন্য তিনি ঘোষণা করেন 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয় (Friendship to all and malice to none)'। তিনি ১৯৭২ সালে আরও বলেন, "পৃথিবীর সকল জাতির সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাই আমাদের বৈদেশিক নীতির মূল কথা। আমরা বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ডে পরিণত করতে চাই।" বঙ্গবন্ধু সরকারের অন্যতম সফলতা হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শুরু থেকেই বাংলাদেশের জন্য জোট নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করেন। তাই বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে কমনওয়েলথের, ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমল

ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার

মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে বিশেষ করে ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনী এক সঙ্গে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ভারতীয় মিত্রবাহিনীর প্রায় এক লক্ষ সৈন্য এ সময় বাংলাদেশে প্রবেশ করে। স্বাধীন-সার্বভৌম করার অব্যবহিত পর শেখ মুজিবুর রহমান একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন, শুধু আলোচনার মাধ্যমে এ দেশের মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করার একক কৃতিত্বও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আন্তরিক সহযোগিতা ছিল তুলনাহীন। স্বাধীনতার ৯০ দিনের মাথায় সদ্য স্বাধীন একটি দেশের মাটি থেকে বিদেশি একটি দেশের সৈন্য প্রত্যাহার করিয়ে নেওয়া বিরল এক ঘটনা। শক্তিশালী দেশগুলোর কাছ থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়ে এই সৈন্য প্রত্যাহারের ঘটনা একটা প্রধান অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। এতদিন তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল। কারণ স্বাধীনতার অন্যতম প্রতীক বিদেশি সৈন্যমুক্ত দেশ। অথচ স্বাধীনতার পরও বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্য বর্তমান। এ রকম পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ইন্দিরা গান্ধী প্রত্যাহার করে নিলেন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী। অচিরেই অনেক দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল এবং আলাপ-আলোচনা শুরু করল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার জন্য ভারতের জনগণ, ভারত সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বঙ্গবন্ধু জানতে চান, বাংলাদেশ থেকে কবে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করবেন? জবাবে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, আপনি যেভাবে বলবেন, সেটাই করা হবে। বঙ্গবন্ধু বলেন, আপনারা অকৃত্রিম বন্ধু বলেই বলছি, বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। কারণ, এখন হচ্ছে বাংলাদেশ পুনর্গঠনের সময়। ইন্দিরা গান্ধী ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে একটু চিন্তা করলেন, এক্সিলেন্সি প্রাইম মিনিস্টার, ১৭ই মার্চ আপনার জন্ম তারিখেই আমাদের সৈন্যরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরে আসবে। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। ভারত সরকারের আমলাতন্ত্র এবং দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক মহলের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে যেদিন ভারতীয় সৈন্যদের শেষ দলটি বাংলার মাটি ত্যাগ করে সেদিন ছিল ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। উল্লেখ্য, ১২ মার্চ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হয় এবং ১৭ মার্চ শেষ হয়।

সংবিধান প্রণয়ন

- ১৯৭২-৭৫ সময়কালে আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনকালে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা।
- ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ঘোষিত স্বাধীনতার সনদ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশে মৌলিক আইনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এই সনদ ছিলো আইনের মূল সূতিকাগার এবং সরকারের সমস্ত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার উৎস। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশের সংবিধান কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত এটিই ছিলো দেশের সংবিধান। এই সনদে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির বিধান করা হয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশের শাসন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল।
- উক্ত ক্ষমতাবলে বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পরের দিন ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারি করেন। অস্থায়ী সংবিধান আদেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। এটি ছিল জনগণকে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন।

9:59 Room

সংবিধান প্রণয়ন

- অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' বলে বাংলাদেশে সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ 'গণপরিষদ আদেশ' ও 'বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্য (সদস্যপদ বাতিল) আদেশ' নামক ২টি আদেশ জারি করে।
- প্রথমটির মাধ্যমে ১৯৭০ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণকে নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। গণপরিষদের একমাত্র দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। আইনসভা হিসেবে কাজ করার কোন ক্ষমতা গণপরিষদের ছিল না। এই আদেশটি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়।
- দ্বিতীয় আদেশ অনুযায়ী গণপরিষদের কোন সদস্য তার রাজনৈতিক দল (অর্থাৎ যে দলের মনোনয়ন পেয়ে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন) থেকে পদত্যাগ করেন, কিংবা উক্ত দল থেকে বহিষ্কৃত হন তাহলে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।
- শেখ মুজিবুর রহমান ৯ এপ্রিল আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি কর্তৃক গণপরিষদের দলীয় নেতা নির্বাচিত হন। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে সহকারী নেতা নির্বাচন করা হয়।

সংবিধান প্রণয়ন

- রাষ্ট্রপতি ১০ এপ্রিল গণপরিষদের অধিবেশন উদ্বোধন করেন। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শাহ আবদুল হামিদ ও মোহাম্মদউল্লাহ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যথাক্রমে গণপরিষদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন।

- উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৪১৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে ১১ এপ্রিল একটি কমিটি গঠন করা হয়। ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন ড. কামাল হোসেন। এই কমিটিতে একমাত্র বিরোধীদলীয় সদস্য ছিলেন আওয়ামী পার্টি- ন্যাপ (মোজাফফর) থেকে ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। কমিটিতে একজন মহিলা গণপরিষদ সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মোট মহিলা সদস্যসংখ্যা ছিল ৭ জন।

সংবিধান প্রণয়ন

- কমিটিতে পরবর্তী ১০ জুনের ১৯৭২ মধ্যে গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া উপস্থাপন করতে বলা হয়। সে অনুযায়ী কমিটি অত্যন্ত দ্রুত সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু করে। ১৭ এপ্রিল কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন সংবিধান বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে সংবিধান বিষয়ে প্রস্তাব আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমিটির ঘোষিত শেষ তারিখের ৮ মে ১৯৭২-এর মধ্যে কমিটি ৯৮টি সুপারিশমালা লাভ করে।

- ১৯৭২ সালের ১১ অক্টোবরের মধ্যে কমিটি সংবিধানের খসড়া চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করে। সংবিধানের খসড়া চূড়ান্ত করার পূর্বে ৯ অক্টোবর তা আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠক উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়েছিল। এভাবে প্রণীত চূড়ান্ত খসড়াটি কমিটির সভাপতি এবং দেশের আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন সংবিধানের বিল আকারে গণপরিষদের অধিবেশনে উপস্থাপন করেন।

সংবিধান প্রণয়ন

- ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে সংবিধান বিল পাশ হয়।
- ১৪ ডিসেম্বর (১৯৭২) স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ ও গণপরিষদ সদস্যগণ সংবিধানের বাংলা ও ইংরেজি কপিতে স্বাক্ষর দান করেন। তবে একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সংবিধান বইতে স্বাক্ষর দানে বিরত থাকেন।
- ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস থেকে সংবিধানটি কার্যকর করা হয়। এরপর গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। গণপরিষদের প্রথম স্পিকার শাহ আব্দুল হামিদ ১২ অক্টোবর ১৯৭২ মৃত্যুবরণ করায় ইতোমধ্যে মোহাম্মদউল্লাহকে স্পিকার ও বায়তুল্লাহকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করা হয়েছিল। গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান গণপরিষদে ঘোষণা করেন যে, বিধিবদ্ধ সংবিধানের আওতায় দেশে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন

- বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকর হবার পর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং সরকার ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান ঘোষণা জারি করেন।
- ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতা সেসময় নিষিদ্ধ ছিল।
- নির্বাচনে জাতীয় সংসদের মহিলা আসনসহ ৩১৫টি আসনের মধ্যে-
  - আওয়ামী লীগ জয় লাভ করে- ৩০৬টি আসনে
  - জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) জয় লাভ করে- ২টি আসনে
  - বাংলাদেশ জাতীয় লীগ জয় লাভ করে- ১টি আসনে
  - স্বতন্ত্র সদস্যরা জয় লাভ করে- ৬টি আসনে

বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ (বাকশাল)

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি গৃহীত সংবিধানের নতুন সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তন করা হয়। সংবিধানের ১১৭ (ক) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ নামে একটি নতুন একক রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

বাকশালের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ১৯৭৫ সালের ৭ জুন বাংলাদেশ গেজেটে দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়।
- বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র এ চার মূলনীতি বাস্তবায়ন করা।
- বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি বিধান।
- নর-নারী ও ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান।
- মানব সত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্যের স্বীকৃতি।
- মানুষের স্বাভাবিক জীবন বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি।
- ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ সাধন।

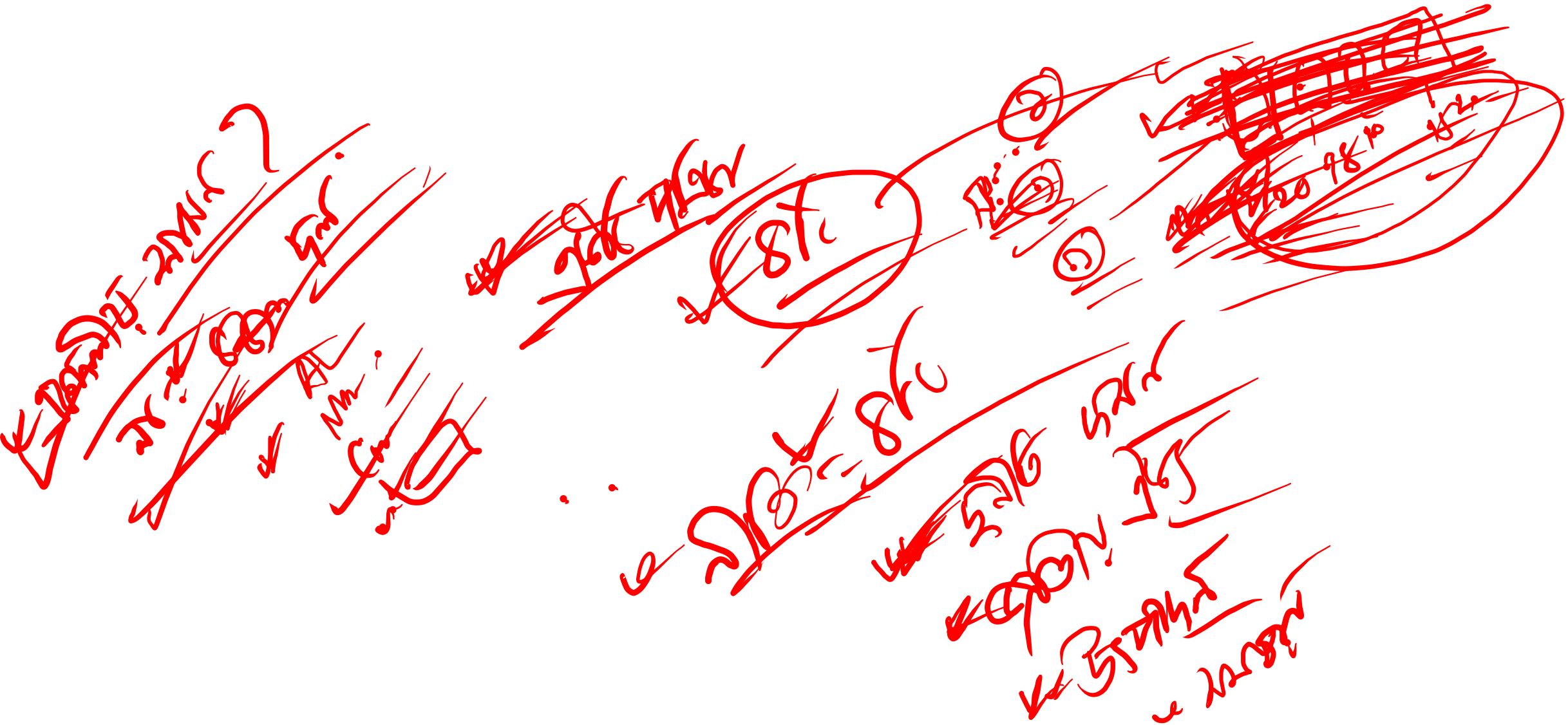

বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ (বাকশাল)

- ✓ কৃষক ও শ্রমিকসহ মেহনতী ও অনগ্রসর জনগণের উপর শোষণের অবসানের জন্য পূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শোষণমুক্ত ও সুষম সাম্যভিত্তিক এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।
- ✓ সর্বাঙ্গীন গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও ক্রমিক যান্ত্রিকীকরণ এবং সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ পদ্ধতি প্রচলন।
- ✓ কৃষি ও শিল্পের প্রসার এবং উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণে কৃষক শ্রমিকের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান।
- ✓ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ ও অধিকতর কর্মসংস্থান, বিপ্লবোত্তর সমাজের প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ গণমুখী সর্বজনীনসুলভ গঠনাত্মক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন।
- ✓ অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয় স্বাস্থ্যরক্ষাসহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণের মৌলিক সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ।
- ✓ বিচার ব্যবস্থার কালোপযোগী জনকল্যাণকর পরিবর্তন সাধন।
- ✓ গণজীবনের সর্বস্তর হতে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা।
- ✓ বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টায় সাহায্য ও সহযোগিতা করা এবং সাম্রাজ্যবাদ বা বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত মুক্তির সংগ্রামকে সমর্থন করা।

বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ (বাকশাল)

এছাড়া ৫টি অঙ্গ সংগঠন ছিল ।
(১) জাতীয় কৃষক লীগ, (২) জাতীয় শ্রমিক লীগ, (৩) জাতীয় মহিলা লীগ, (৪) জাতীয় যুবলীগ এবং (৫) জাতীয় ছাত্রলীগ।

বাকশালের মূল্যায়ন

একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের জন্য বাকশাল গঠন করা হলেও বাকশাল গঠনের আগে ও পরে দেশের অবস্থার তেমন মৌলিক পরিবর্তন দেখা যায়নি। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর) ছাড়া কোন দল বাকশালে সাড়া দেয়নি। কেন্দ্রীয় কমিটির বড় অংশ ছিল প্রাক্তন আওয়ামী লীগের নেতা। দলীয়ভাবে নয় ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় লীগের সভাপতি আতাউর রহমান, জাগমুই দলের সভাপতি হাজী মোহাম্মদ দানেশ, ন্যাপ (ভাসানী) সহ সভাপতি আবদুল করিম বাকশালে যোগ দেন। আওয়ামী লীগের ভেতরও এর বিরোধীর সংখ্যা কম ছিল না। জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী, ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন বাকশালে যোগ না দেওয়ায় সংসদ সদস্য পদ হারান। জাসদের ৩ জন সদস্যের মধ্যে একজন বাকশালে যোগ দেন। যে সব দল বাকশালে যোগ দেয় তারা নিজস্ব দল অবলুপ্ত করে নয় পৃথক অস্তিত্ব রক্ষা করে বাকশালে সক্রিয় হন। অনেক আওয়ামী লীগ নেতা পদ হারানোর ভয়ে বাকশালে যোগ দিলেও এতে তাদের সায় ছিল না।

বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ (বাকশাল)

বাকশালের লক্ষ্য, কর্মসূচির অনেক কিছু ছিল অস্পষ্ট। বিশেষ করে থানা পর্যায়ে বিচার ব্যবস্থার প্রকৃত কাঠামো কেমন হবে তা স্পষ্ট ছিল না। গ্রামীণ সমবায় গঠনের মাধ্যমে গ্রামে ইউনিয়ন পরিষদ বাতিলের উল্লেখ থাকায় এতো দিনের গড়ে ওঠা এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা আতঙ্কিত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগ বিলুপ্তির যে কারণ দেখিয়ে বাকশাল গঠিত করে সেই লোকদের বিরাট অংশ নতুন দলেও পদবি নিয়ে ফিরে আসেন। মন্ত্রিসভায় ড. এ. আর মল্লিক, ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ছাড়া সকলে পুরনো। বাকশালের ৫টি অঙ্গ সংগঠনের চারটির নেতৃত্বে ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতারা। বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির ১১৫ জনের মধ্যে শুধু ১০ জন ছিলেন অন্য দলের।

সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে বাকশালের কর্মসূচি বাস্তবায়নের আগেই ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। দেশের আর্থ-সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণে বাকশাল নামে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হলেও ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি থেকেই বিভিন্ন কারণে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়। বোরো ধানের ভালো ফলন, আটকেপড়া বৈদেশিক খাদ্যশস্য দেশে পৌঁছানো, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কারণে দেশের অর্থনীতি খানিকটা অগ্রগতি লাভ করে। দাতা দেশগুলো বিশেষ করে বিশ্ব ব্যাংকের উন্নয়ন বরাদ্দ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশ অর্থনৈতিক ধস কাটিয়ে উঠতে থাকে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ১১১.৪৯ কোটি টাকা থেকে ৩৫০.৮০ কোটি টাকায় উন্নতি হয়। জুন মাস নাগাদ জানুয়ারি মাসে চালের দাম ৮ টাকা থেকে কমে ৫.৫০ টাকা নেমে আসে। বাকশাল কর্মসূচি বাস্তবায়ন না হওয়ায় এ বিষয়টির এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে নৃশংসভাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে ঘাতকরা।

শেখ মুজিবের বাসভবন

রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বাসায় অভিযানের নেতৃত্ব দেন মেজর একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ। মেজর বজলুল হুদা রাষ্ট্রপতির বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণকারী প্রথম ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের অ্যাডজুট্যান্ট থাকায় তাকে দলে রাখা হয়েছিল। দলে মেজর এসএইচএমবি নূর চৌধুরীও ছিলেন । রক্ষীদের দায়িত্বে থাকা ক্যাপ্টেন আবুল বাশার মেজর ডালিমের অধীনে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিদ্রোহীরা জোর করে বাসভবনে প্রবেশের চেষ্টা করলে বাসভবন রক্ষা করতে যেয়ে কিছু রক্ষী নিহত হয়েছিল। শেখ কামালকে ক্যাপ্টেন হুদা হত্যা করেছিলেন। শেখ মুজিবকে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় মেজর নূর ও ক্যাপ্টেন হুদা তাঁকে গুলি করেন। শেখ মুজিবের ছেলে শেখ জামাল, জামালের স্ত্রী রোজী, শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল, শেখ মুজিবের স্ত্রী শেখ ফজিলাতুন্নেছাকে প্রথম তলায় বাথরুমে নিয়ে মেজর আবদুল আজিজ পাশা ও রিসালদার মোসলেহ উদ্দিন গুলি করে তাদের সবাইকে হত্যা করে। ফারুক এসে পৌঁছে গেলেন একটি ট্যাঙ্কে। শেখ মুজিবের ডাক পেয়ে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমদ বঙ্গবন্ধুর আবাসে যাওয়ার পথে নিহত হন।

রক্ষীবাহিনী একটি সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের পরে আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁদের বাড়ির বাইরে সারিবদ্ধ করা হয়। মেজর নূর অভ্যর্থনা এলাকার বাথরুমে শেখ মুজিবের ভাই শেখ নাসেরকে গুলি করেছিলেন। মেজর পাশা একজন হাবিলদারকে মায়ের কাছে কাঁদতে থাকা শেখ রাসেলকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শেখ ফজলুল হক মণির বাসভবন

শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণি তার গর্ভবতী স্ত্রী বেগম আরজু মনির সাথে তার বাড়িতে নিহত হন । তাঁর ছেলে শেখ ফজলে নূর তাপস ও শেখ ফজলে শামস পরশ বেঁচে গিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ধানমন্ডিতে ১৩/১১ রোডে তাঁর বাড়িটি ২০-২৫ সেনা সদস্য দ্বারা ঘেরা ছিল।

আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসভবন

আবদুর রব সেরনিয়াবাত প্রাক্তন পানি সম্পদ মন্ত্রী (শেখ মুজিবুর রহমানের ভগ্নীপতি) মিন্টু রোডে তার বাসায় ভোর ৫ টা ৫০ মিনিটে নিহত হন। তার বাড়িতে মেজর আজিজ পাশা, ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদ, মেজর শাহরিয়ার রশিদ এবং ক্যাপ্টেন নুরুল হুদা নেতৃত্বাধীন একটি দল আক্রমণ করেছিল। এই হামলায় সেরনিয়াবাতের ভাগ্নে শহীদ সেরনিয়াবাত, কন্যা বেবি সেরনিয়াবাত, নাতি সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু এবং ছেলে আরিফ সেরনিয়াবাতও নিহত হন। এই হামলায় তিনজন গৃহকর্মীও নিহত হন। তার ছেলে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ হামলায় বেঁচে গিয়েছিলেন এবং ওই বাড়িতে আরও ৯ জন আহত হন।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড

যারা শহিদ হয়েছিলেন

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী শেখ ফজিলাতুন্নেসা, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল, শেখ জামালের স্ত্রী রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, এসবি অফিসার সিদ্দিকুর রহমান, কর্নেল জামিল, সেনা সদস্য সৈয়দ মাহবুবুল হক, প্রায় একই সময়ে ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মণির বাসায় হামলা চালিয়ে শেখ ফজলুল হক মণি, তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় হামলা করে সেরনিয়াবাত ও তার কন্যা বেবী, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, নাতি সুকান্ত বাবু, আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বড় ভাইয়ের ছেলে সজীব সেরনিয়াবাত এবং এক আত্মীয় বেন্টু খান (মোট ১৮ জন)।

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ

১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। ২৪ আগস্ট ১৯৭৫ মেজর জেনারেল কেএম শফিউল্লাহকে সরিয়ে দিয়ে মোশতাক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর 'চিফ অব আর্মি স্টাফ' নিয়োগ করে। ১৯৭৫ সালের ৩০ আগস্ট মোশতাক এক অর্ডিন্যান্স জারি করে সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করে। রাজনৈতিক দল গঠন, সংগঠন প্রতিষ্ঠা বা আয়োজন অথবা রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়া অথবা অন্যভাবে রাজনৈতিক তৎপরতায় শরিক হওয়া অথবা কোনোভাবে রাজনৈতিক কাজে সংশ্লিষ্ট থাকার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

যা লঙ্ঘন করলে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, মোশতাক বন্দুকের জোরে কুখ্যাত 'ইনডিমনিটি অর্ডিন্যান্স' জারি করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টের খুনিদের সুরক্ষা প্রদান করে।

খন্দকার মোশতাক আহমেদের নির্দেশে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কিছু বিপথগামী সেনা সদস্য সকল নিয়মনীতি ভঙ্গ করে কারাভ্যন্তরে প্রবেশ করে জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামানকে ব্রাশফায়ারে নির্মমভাবে হত্যা করে। এদিন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৪৬ ব্রিগেডের কিছু তরুণ অফিসারকে দিয়ে জিয়াকে গৃহবন্দি করেন এবং জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধান পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ৪ নভেম্বর মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ 'চিফ অব আর্মি স্টাফ' পদে নিয়োগ পান।

খালেদ মোশাররফের দাবি অনুযায়ী ৫ নভেম্বর খন্দকার মোশতাক বিচারপতি আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েমের কাছে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ৬ নভেম্বর জাতীয় সংসদ বাতিল করা হয়। বিচারপতি সায়েম আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এদিকে কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে আরেকটি অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ৬ নভেম্বর রাতেই তারা রেডিও স্টেশন দখল করে নেয়। বিদ্রোহী সেনাদের গুলিতে মহান মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী সাহসী সেনাপতি মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর হুদা ও মেজর হায়দার নিহত এবং কর্নেল শাফায়াত জামিলসহ কয়েকজন আহত হন। কর্নেল তাহের মুক্ত করেন জিয়াউর রহমানকে। ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ সকালে ঢাকার রাজপথ আবার সেনা ট্যাংকে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড

জিয়াউর রহমান মুক্তি পেয়ে বেতার ভাষণের মাধ্যমে নিজেই নিজেকে সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা করেন। ২০ নভেম্বর জিয়াউর রহমান মেজর জেনারেল এরশাদকে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ নিয়োগ করেন। জিয়াউর রহমান কর্নেল তাহেরসহ ২৩ ও ২৪ নভেম্বর এমএ জলিল, হাসানুল হক ইনুসহ জাসদ ও গণবাহিনীর অধিকাংশ নেতাকে আটক করে।

২৪ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের এক হাউস টিউটরের বাসা থেকে কর্নেল তাহেরকে গ্রেফতার করা হয়। জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালের ১৭ জুলাই এক বিশেষ সামরিক আদালতে 'সরকার উৎখাত ও সেনাবাহিনীকে বিনাশ করার চেষ্টা চালানোর' অভিযোগে জাসদ নেতা কর্নেল তাহেরকে মৃত্যুদণ্ড এবং এমএ জলিল, আ স ম আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ, হাসানুল হক ইনু, সিরাজুল আলম খানসহ অনেককেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠিত হয়। শহিদ জননী নামে খ্যাত জাহানারা ইমাম (ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য শহিদ শফি ইমাম রুমির মা) হন এর আহ্বায়ক। এই কমিটি ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ গণ আদালতের মাধ্যমে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একাত্তরের নরঘাতক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ১০টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করে। ১২ জন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত আদালত গোলাম আযমের ১০টি অপরাধ মৃত্যুদণ্ড যোগ্য বলে ঘোষণা দেয়।

বিচারের জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার

- ✓ বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ঘোষণা দেন- ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে।
- ✓ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য প্রথম আইন- Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972.
- ✓ দালাল আইনের অধীনে গ্রেপ্তার করা হয়- ৩৭ হাজারের বেশি ব্যক্তিকে।
- ✓ ১৮ ধরনের অপরাধে জড়িতদের বাইরে রেখে বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন- ৩০ নভেম্বর, ১৯৭৩ সালে।
- ✓ যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার অভিযোগ বিচারের জন্য শনাক্ত করে- ১৯৫ জন।
- ✓ পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট হয়- ১৯৭৩ সালে।
- ✓ ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্টের সংশোধনী পাশ হয়- ৯ জুলাই, ২০০৯ সালে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]

10 [illegible]

[illegible]

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল

২৩ মার্চ, ২০১০	যুদ্ধাপরাধের বিচারের আন্তর্জাতিক আইন রোম বিধিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে।
২৫ মার্চ, ২০১০	যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল (বাংলাদেশ) গঠিত হয়।
২০ নভেম্বর, ২০১১	বিচার কার্যক্রম শুরু।
২৫ মার্চ, ২০১২	আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ গঠন করা হয়।
২১ জানুয়ারি, ২০১৩	প্রথম রায় প্রদান কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে।
১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫	২টি ট্রাইব্যুনাল একীভূত হয়।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

যুদ্ধাপরাধের বিচারের গুরুত্ব:

মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার এ শতাব্দীতে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর জন্য দীর্ঘ চল্লিশ বছর আন্দোলন করতে হয়েছে। এখানে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের গুরুত্ব তুলে ধরা হল-

- **ইতিহাসের দায়মুক্তি:** এই বিচারকার্য সম্পাদনের মাধ্যমে ইতিহাসের কলংকিত একটি অধ্যায় মুছে দেয়া সম্ভব হল। স্বাধীন দেশে এ সকল অপরাধী যখন ঘুরে বেড়ায় ঠিক তখনি জাতি হিসেবে লজ্জাজনক অবস্থায় পড়তে হয়। ইতিহাস অপরাধীদেরকে ঠিকই স্মরণে রেখেছে। তাদের ঘৃণ্য কাজগুলোকে মনে রেখেছে। তাই এই বিচারকাজ সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে ইতিহাসের দায় মুক্তি ঘটল।
- **শহীদদের রক্তের ঋণ:** লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা। মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার কাজ সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে শহীদের রক্তের ঋণ শোধ করা সম্ভব না হলেও তাঁদের মর্যাদা অন্তত রক্ষা করা সম্ভব হলো।
- **বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ:** ১৯৭৩ সালে যুদ্ধাপরাধীর বিচারের জন্য আইন প্রণয়ন ও সংবিধান সংশোধনের কাজ সম্পন্ন করে বিচার কাজ শুরু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট তার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে যুদ্ধাপরাধীর বিচার কাজ থেমে যায়। তাই শেখ হাসিনা সরকারের আমলে বিচার কাজ সম্পন্ন হওয়ার অর্থ হলো শেখ মুজিবের অসম্পন্ন কাজের সমাধান।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

- **মৌলবাদের পতন:** মানবতা বিরোধী অপরাধীরা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে মৌলবাদ এবং জঙ্গীবাদ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিল। বিচার সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে বলা যায় মৌলবাদের পতন ঘটেছিল।

- **বাঙালি জাতীয়তাবাদ:** যুদ্ধাপরাধীর বিচার প্রমাণ করে যে, ঐক্যবদ্ধ বাঙালি কখনোই সাম্প্রদায়িকতাকে বাংলার মাটিতে স্থান দেবে না।

- **সরকারের প্রতিশ্রুতি:** ২০০৮ সালে নির্বাচনি ইশতেহারের অন্যতম এজেন্ডা ছিল যুদ্ধাপরাধীর বিচার। কাজেই যুদ্ধাপরাধীর বিচার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে সরকারের প্রতিশ্রুতি রক্ষা হলো।

- **বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি:** বিশ্ববাসী সবসময় যুদ্ধাপরাধীদের বিপক্ষে যে কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ন্যুরেমবার্গ মামলার মাধ্যমে অপরাধীদের সাজা হয়েছে। কাজেই যেহেতু- বাংলাদেশেও যুদ্ধাপরাধীর বিচার হয়েছে সেহেতু বিশ্বাবাসী এটিকে সাধুবাদ জানিয়েছে।

- **ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষা:** ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এটি একটি শিক্ষা যে, বাঙালি জাতি বীরের জাতি এবং যারাই এরকম অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা করবে তারা কেউই রেহাই পাবে না।

মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী হলো ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছরপূর্তি পালনের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত একটি বার্ষিক পরিকল্পনা। সরকার ২৬ মার্চ ২০২১ থেকে ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের ঘোষণা দিয়েছে। এরই সঙ্গে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুজিব বর্ষও পালিত হবে। ২০০৮ সালের সংসদীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তেহারের মধ্যে ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে "রূপকল্প ২০২১" ঘোষণা করা হয়, যেখানে ২০২১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল, ডিজিটাল ও আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রত্যয় দেয়া হয়। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ বছরজুড়ে উদ্‌যাপিত অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। মুজিব বর্ষের ধারাবাহিকতায় সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানটি পালিত হয়।

মুজিব বর্ষে যেসব রাষ্ট্রপ্রধান/সরকার প্রধানরা বাংলাদেশে আগমন করেন

দেশ	রাষ্ট্রপ্রধান/সরকার প্রধান	আগমন	দেশ	রাষ্ট্রপ্রধান/সরকার প্রধান	আগমন
মালদ্বীপ	প্রেসিডেন্ট ইব্রাহীম মোহাম্মদ সালিহ	১৭ই মার্চ	ভুটান	প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং	২৩ মার্চ
শ্রীলংকা	প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দ্র রাজা পাকসে	১৯ মার্চ	ভারত	প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি	২৬ মার্চ
নেপাল	প্রেসিডেন্ট বিদ্যাদেবী ভান্ডারী	২২ মার্চ			

মুজিব শতবর্ষ

মুজিব বর্ষ হলো বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিক পালনের জন্য ঘোষিত বর্ষ। বাংলাদেশ সরকার ২০২০-২১ সালকে (১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে ২৬ শে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত) মুজিব বর্ষ হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত এ বর্ষ উদযাপন করার কথা থাকলেও, করোনাভাইরাসের কারণে গ্রহণ করা কর্মসূচিগুলো নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে করতে না পারায় মুজিব বর্ষের মেয়াদ প্রায় ৯ মাস বাড়িয়ে সময়কাল ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়। বাংলাদেশের জাতির পিতা এবং বঙ্গবন্ধু খ্যাত নেতা অবিভক্ত ভারতের পূর্ববঙ্গে যা বর্তমানে বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রাম, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। মুজিব বর্ষের লোগোর নকশা করেন সব্যসাচী হাজরা।

❖ কর্মসূচি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা তৃণমূল পর্যায়ে প্রচারের পাশাপাশি প্রতি বছরের মতই তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, জাতীয় শোক দিবস এবং জেল হত্যা দিবসও পালিত হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছে।

মুজিব শতবর্ষ

- মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ১ মার্চকে বিমা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
- শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে আ. ফ. ম. বাহাউদ্দিন নাছিম, ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট লিমিটেডের কে এস এম মোস্তাফিজুর রহমান বগুড়া জেলার শেরপুরে ১০০ বিঘা আকৃতির জমিতে "শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু" নামে একটি ম্যুরাল তৈরি করেন। ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস ম্যুরালটিকে "বৃহত্তম শস্যচিত্র" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

❖ বৈশ্বিক উদযাপন

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক অঙ্গসংগঠন ইউনেস্কোর ৪০তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে মুজিব বর্ষ পালনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০১৯ সালের ১২-২৭ নভেম্বরে প্যারিসে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে ২৫ নভেম্বরে ইউনেস্কোর সকল সদস্যের উপস্থিতিতে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মুজিব শতবর্ষ

❖ মুজিব বর্ষের আয়োজন: মুজিব বর্ষ উপলক্ষের নিম্নলিখিত আয়োজন করা হয়:

➲ ১০ দিন ব্যাপী জাতীয় অনুষ্ঠান মালা

➲ মুজিব বর্ষের ওয়েবসাইট চালু

➲ মুজিব বর্ষের ডাকটিকিট প্রকাশ

➲ ১০০ দিনব্যাপী কুইজ প্রতিযোগিতা

➲ গৃহহীনদের মাঝে বিনামূল্যে ঘর বিতরণ

➲ রাষ্ট্রায়ত্ব ফোন টেলিটকের শতবর্ষ নামে বিশেষ মোবাইল প্যাকেজ বিনামূল্যে প্রদান

➲ মুজিব বর্ষে দেশিয় যোগাযোগ অ্যাপ আলাপ চালু হয়

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- বাংলাদেশে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক যুদ্ধাপরাধের বিচারের তাৎপর্য বর্ণনা করুন। [৪০তম বিসিএস]
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'ক্যারিশম্যাটিক' নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৪০তম বিসিএস]
- বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস-আলোচনা করুন। [৩৬তম বিসিএস]
- স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার কার্যক্রম-পর্যালোচনা করুন। [৩৬তম বিসিএস]
- যুদ্ধাপরাধ কী? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য কয়টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যৌক্তিকতা বর্ণনা করুন। [৩৩তম বিসিএস]
- স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশ্ব সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৩০তম বিসিএস]

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি (https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

09666775566
www.uttoron.academy